GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

B
Class No. 891.444
Book No. T479 sah
N. L. 38. C.3
MGIPC—S1—12 LNL/58—23-5-58—50,000.

শ্রীইন্দিরা দেবী
২৭শে অক্টোবর ১৯৩৭

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যের পথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

সাহিত্যের পথে

প্রথম সংস্করণ ... আশ্বিন, ১৩৪৩

NATIONAL LIBRARY
9530
24.4.61
CALCUTTA

মূল্য—১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে

সূচী

বিষয় প্রথম প্রকাশ	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাহিত্য (বঙ্গবাণী—১৩৩১, বৈশাখ)	১
তথ্য ও সত্য (বঙ্গবাণী—১৩৩১, ভাদ্র)	১২
সৃষ্টি (বঙ্গবাণী—১৩৩১, কার্ত্তিক)	২৭
সাহিত্যতত্ত্ব (প্রবাসী—১৩৪১, বৈশাখ)	৪০
সাহিত্যের তাৎপর্য্য (প্রবাসী—১৩৪১, ভাদ্র)	৬৪
সাহিত্যধর্ম্ম (বিচিত্রা—১৩৩৪, শ্রাবণ)	৮২
সাহিত্যে নবত্ব (প্রবাসী—১৩৩৪, অগ্রহায়ণ)	৯৩
কবির কৈফিয়ৎ (সবুজপত্র—১৩২২, জ্যৈষ্ঠ)	১০২
বাস্তব (সবুজপত্র—১৩২১, শ্রাবণ)	১১১
সাহিত্য-বিচার (প্রবাসী—১৩৩৬, কার্ত্তিক)	১২২
আধুনিক কাব্য (পরিচয়—১৩৩৯, বৈশাখ)	১৩১
পরিশিষ্ট	
পত্রালাপ (সাধনা—১২৯৮-১২৯৯)	১৫৫

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্যাণীয়েষু

রস-সাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এসেছি ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানা রকম ক'রে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলি আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিচনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক্, অতথ্য হোক্ কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হোতে নানা খানা, রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হোতে পারলেই খুসি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয়

খুসি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির ক'রে রেখেছিলেম সৌন্দর্য্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খট্‌কা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে প্রচলিত সৌন্দর্য্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল এতদিন যা উল্টো ক'রে বলছিলুম তাই সোজা ক'রে বলার দরকার। বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে ওথেলো নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্য্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব ক'রে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে

উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত ক'রে রাখে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ব'লে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। এ'কে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুসি হয়ে, লীলা যদি না হোত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট ক'রে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌স্-এর বাণী মনে পড়ল—"Truth is beauty, beauty truth।" অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা "হৃদা মনীষা মনসা" উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য ক'রে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি

আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্চেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্চে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্চে তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে, এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত ক'রে নেয়, সে অসুন্দর হোলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলঙ্কারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দ সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে।

তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ ক'রে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়। ইতি—৮ আশ্বিন, ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে

সাহিত্য *

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হোলো আমরা আছি, আর-একটি আমরা জানি, আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা।—সেটি হচ্ছে আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বল্‌তে গেলে বলা যায়—I am, I know, I express, মানুষের এই তিন দিক্ এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিনভাব আমাদের নানাকাজে ও প্রবর্ত্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টিঁকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানা রকমের সংগ্রহ, রক্ষণ, ও গঠন-কার্য্য। "আমি আছি" সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে "আমি জানি"।—এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলি বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে

* ১৩৩০ সনের ১৮ই ফাল্গুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা

খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানব-সত্যের আরেকটি দিক্ আছে "আমি প্রকাশ করি।" "আমি আছি" এইটি হচ্চে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত, "আমি জানি" এটি ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপের অন্তর্গত, "আমি প্রকাশ করি" এটি ব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের অন্তর্গত।

আমি আছি এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা,—তেম্নি, আমি জানি এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা,—কেননা মানুষের স্বরূপ হচ্চে জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব মানুষ যে কেবলমাত্র জান্‌বে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞান-স্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে, মঙ্গল-গ্রহে যে চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত ক'রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত ক'রে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টিঁকে থাক্‌তে হবে, এই কথাটি যখন সঙ্কীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশ-রক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁক্‌ড়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে মানুষ বলে যে অন্যের টিঁকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়, সেই পরিমাণে আমি আছি এবং অন্য সকলে আছে এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্চে আত্মার ঐশ্বর্য্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা-প্রকারে প্রকাশ কর্‌তে থাকে। যেখানে এক্‌লা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার

মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্ত্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্ব্বে বলেছি কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিঁকে থাক্‌বার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা কত বিশ্ব-বিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হোতে থাকে, কিন্তু তার বিশুদ্ধ আনন্দ-রসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখ্‌ছি যে পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিঁকে থাক্‌বার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্ব্বদা সচেষ্ট, তেম্‌নি মানুষের আর-একটি জিনিষ আছে যা পশুদের নেই, সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র প্রাণ-ধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশ-তত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্য্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন, সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হোতে হোতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্য্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্চে তাপের ঐশ্বর্য্য।

মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্য্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখ্‌তে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য্য আছে কোন্‌খানে? যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্চে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বল্‌তে পারি—এ যে আমার। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষ ভোগ্য টাকার বর্ব্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈন্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈন্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সেই দৈন্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ,—সে যার, কেবল মাত্র তারই, এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্ত-পঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্যামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্চে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্য্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লজ্জায় কেবলি ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্চে যে আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে,—আর ঐ যে উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেল্লাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে, সে কিছুই নয়,

কেননা ওর নিজে ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না—মাধবী-বিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।

এই যে তাজমহল—এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহ-বেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে-কোঠাতেই রাখুন, তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন পর নেই, সে অনন্তের বেদী। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে, তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক্ তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্ব্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ-করবার মন্ত্র হচ্চে ওঁ—অর্থাৎ হাঁ। তাজমহল হচ্চে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ—নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্ত্তি-মান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি—একদিন তার যতই শক্তি থাক্ না কেন—সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো-বড়ো নামধারী "না"য়ের দল আজ দম্ভ-ভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামান-গর্জ্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-ঝঙ্কৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রি-পারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে চলেছে। কিন্তু ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি ওঁ।

কিন্তু আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে

পারি? যদি বলি "তুভ্যমহং সম্প্রদদে", তাহোলেই কি বর এসে হাত পাতেন? নিত্য কাল এবং নিখিল বিশ্ব এই কথাই বলেন—যদেতৎ হৃদয়ং মম তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তং যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন, তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই শান্ত্রী পাহারা দিয়ে তাঁর অন্তঃপুরের হংসপদিকা-দের মহলে আটকে রাখ্‌তে পারেনি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন তা খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশো বছর পূর্ব্বে কি পরে রচিত? তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে। পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন তা শিপ্রা-তীরে রচিত হয়েছিল, না গঙ্গাতীরে? তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর পক্ষে এমন সব পাঁচালি আছে যার অনুপ্রাস-ছটার চক্‌মকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই না কেন সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল সুনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল তাদের বর্জ্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো ব্যর্থ কুল-গৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ ক'রে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন? বলেছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি-ভাতি। এইটে হোলো আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদ-খানা হোত তাহোলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে ব'সে থাক্‌তেম, বল্‌তেম আমাদের পানাহার বন্ধ। কিন্তু আমি তো স্পষ্টই দেখ্‌ছি কেবল যে চারিদিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পাটকলের কার্‌খানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরী পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারো মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে, তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু জগতে তো দেখ্‌ছি সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্চে এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধ-বোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ দেখ্‌ছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সাম্‌নেই। তাহোলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে, না রয়েছে কবির আনন্দ।

এই যে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, এই যে আকাশ থেকে ধরণী পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের প্লাবন, এর মধ্যে তো কোনো জবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাইনে। ক্ষুধার মধ্যে একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা না-এর ছাপা-মারা জিনিষ। হাঁ আছে বটে ক্ষুধা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে নেয়। তাহোলে কোনটাকে সামনে দেখব আর কোনটাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাক-শালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্ত্তার উদ্দেশ্যটি কোনখানে প্রকাশ পায়—যেখানে নিমন্ত্রণ-পত্র-হাতে ছাতা-মাথায় হেঁটে এলেম, না, যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জ্জন হোলো একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন—তাই আমাদের হৃদয় বলে "আঃ বাঁচলেম।"

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে—যখন কমিটি-মিটিংএ

তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তার পর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সাম্‌নে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বল্‌ব? বলি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে 'যৎ', আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ? সে কি শক্তি-পদার্থ?

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ? মোগল সম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠ-খড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে? তার মূর্ত্তি কোথায়? আওরঙ্‌জেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্ত-রেখায় শক্তিকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশ-স্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্চেন, তিনি সেই রক্ত-রেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি সুরু করেছেন। আর তাঁর আলোক-রশ্মির সম্মার্জ্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জ্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন ক'রে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সাম্‌নে রাখতেন তাহোলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হোতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিঃশ্বাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপরে পাগ্‌লা ঝড়ের যে নৃত্য তার আয়োজন হচ্চে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের মোকাবিলায় রহস্যালাপ হোতে পার্‌ল।

না হয় ডুবেই মরতেম—সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা? রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার সাকৃরেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো একটা চক্র-হাওয়ার দ্রুত-তালের তান শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম তুমি আমার আপনার।

অমৃতের দুটি অর্থ—একটি, যার মৃত্যু নেই—এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হোলো রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বল্‌ব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন—অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়! কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়?

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়—"রূপদক্ষ" যে রূপ রচনা করেন—সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয়—তবে সে মৃত্যুঞ্জয়ী। এই 'রূপদক্ষ' কথাটি আমার নূতন পাওয়া। Inscription অর্থাৎ একটা প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিষ্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ী ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন শমে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাঁকা দিলেম। শম মানে তো থামা—তাতে আনন্দ কেন? তার কারণ হচ্ছে আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো শমে মাথা নেড়ে বলিনে—আঃ!

গান থাম্‌ল—তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থাম্‌ল না কেন? তার কারণ, গানের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে—কাজেই সে সেই ওঁকে আশ্রয় ক'রে থেকে

যায় ;—তার জন্যে কোনো গর্ত্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষতঃ কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে যায় না। কত অমূল্যধন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে—কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্চে এই যে তারা আনন্দের ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করেনি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরীব চাষার রক্তকে ঘূর্ণী চাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্চে। গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়া-সমাশ্রিত যে দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হাঁ-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্গীর্ণ করছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা আনন্দ-লোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝ'রে যায়, ভয় নেই; কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের ডালিতে অমৃত-মন্ত্র আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত ক'রে দিচ্ছিল, তারা আর ফিরে এল না; যে-সব অগ্নি-নাগিনী রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ফণা তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল তারা কোন্ বাঁশি শুনে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কচি কচি শ্যামল ঘাসের কোমল চুম্বন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্চে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটা-গাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হোলো কণ্টিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হল্‌দে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্য্যের কিরণকে সে

ধ্যান করে, সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানটিতে যেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে? আর এ কি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে না? কিন্তু তাতে ক্ষতি হোলো কী? পৃথিবীর অতি বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনো রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের যাচাই হোতে থাকে। খৃষ্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খৃষ্টীয় পুরাণে আছে? মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হোলো না কি? কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে—আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে ক'রে নিয়ে সে যদি এসে থাকে, তাহোলে মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে—আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এসব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে—আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসঙ্গত। কিন্তু আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছিনে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে—তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্চে সব শেষের কথা—এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব, তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।

তথ্য ও সত্য *

সাহিত্য বা কলা রচনায় মানুষের যে-চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মানুষের খেলা কর্‌বার প্রবৃত্তিকে কেউ কেউ এক ক'রে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসর-বিনোদন, সাহিত্য ও ললিত-কলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্চে প্রাণ-ধারণ, টিঁকে থাকা। সেজন্যে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরো একটু বড়ো হোলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবন-যাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এই রকম অনর্থকতার ভান ক'রে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে মাতৃভাব নিয়ে জন্মেচে তার পরিচালনার জন্যেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষা-বৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র, বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এই রকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই, যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তাদের খেলায়

* ১৩৩০ সনের ১৯শে ফাল্গুন, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতা।

প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্চে ফলাসক্তিহান কর্ম্ম; এখানে কর্ম্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসত্ত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেই জন্যে খেলার মধ্যে জীবন-যাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবন-যাত্রায় যে লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে, দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখ্‌তে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীব-যাত্রা-ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে প্রকাশ-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্চে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্‌বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন ব্যবসায়েরই নকল ক'রে থাকি,একথা বল্‌তে তো মন সায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক না কেন, এমন কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল ক'রে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনই নয়।

বিদ্যাপতি লিখ্‌ছেন,—

“যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।”

গোধূলি-বেলায় পূজা শেষ ক'রে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে—আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দ রচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি? জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য? তা কখনই স্বীকার করতে পারিনে। বস্তুত,

মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্য মাত্র ক'রে ছন্দে বন্ধে, বাক্য-বিন্যাসে, উপমা-সংযোগে যে-একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্চে আসল জিনিষ। সে জিনিষটি মূল বিষয়েব অতীত, তা অনির্ব্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ একটি গ্রীক্ পূজা-পাত্রকে উদ্দেশ্য ক'রে কবিতা লিখেছেন। যে শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা করেনি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ মাত্র ঘটাবার জন্মে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজন-সাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয়নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে, রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয়নি, বহিঃসংসারের কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি করেনি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্য্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা, তাকে খেলা না ব'লে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্চে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্য কর্ম্মের দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাক্‌তেও পারে। কিন্তু সেটা অবান্তর।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা কিছু জানি কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা, সেখানে জানি মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময়

হয়, যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন এককে বাহিরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য ক'রে উপাদানকে আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক্ শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্ত্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকে একের মিলন হয়। যে মানুষ অরসিক, সে এই চরম এককে দেখতে পায় না, সে কেবল উপাদানের দিক থেকে প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

"শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথি
মত্ত মধুপ ভোরনী।"

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কা-বৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্য রসের চরমতাকে অতিক্রম ক'রে আর কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হোলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টি-লীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী-এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় ব'লে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত যে-ঐক্য, নিখিলের

অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সঙ্গীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল্ এই ফুলের সুষমাটিকে আপন ব'লে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-একদিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টি-লীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে থাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থ-কামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেই জন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ ক'রে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ—লোভ করবে না। কারণ লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোতে হয়। লোভীর হাতে কামনার সেই লণ্ঠন, যা-কেবল একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে—বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব লোভের এই সঙ্কীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাৎ। নিখিলকে ছিন্ন ক'রে হয় লাভ, নিখিলকে এক ক'রে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্ত্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ ক'রে সেই তো বিরাজ করে। কীট্‌স তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীক পাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন :—

"Thou silent form, dost tease us out of thought,
As doth eternity."

হে নীরব মূর্ত্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল ক'রে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম। কেননা, অখণ্ড একের মূর্ত্তি যে-আকারেই থাক না, অসীমকেই প্রকাশ করে; এই জন্যই সে অনির্ব্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকুতি, যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হোলো না, সেই সৃষ্টির আকুতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকুতিই তো সেই বেদনা, যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত ক'রে রয়েছে। সে "রোদসী" "ক্রন্দসী" —সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে নানা আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত—সূর্য্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে রস মানুষের কাছে এসে পৌছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে জল তার জন্যে ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কী? কী বিচিত্র এর গড়ন, কত রং দিয়ে আঁকা? এ'কে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে; বলতে পারো সমস্তই বাজে খরচ হোলো। সে কথা মানি; সৃষ্টির বাজে-খরচের

বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গী। যারা মুনফার হিসাব রাখে, তারা বলে এটা লোকসান; যারা সন্ন্যাসী, তারা বলে এটা অসংযম। বিশ্বকর্ম্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না; বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্চেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হোলো না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সঙ্গীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্চে। ভোল্‌বার জো কী! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন ক'রে পারো আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত ক'রে দাও। এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌচেছে, সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তম্বুরা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে? সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তার জঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের চাবুকের চোটে প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে চলবে? লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে:—"আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হোতে চাইনে, আমি তো পালোয়ান হোতে চাইনে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।"

এই কথাটি জানতে হবে—মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন মনে গান গেয়েছি, তখন কীট্‌সের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল ক'রে তুলেছে—জিজ্ঞাসা করেছি—এ কি একটা মায়া মাত্র, না এর কোনো অর্থ আছে? গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিষের মূল্য যেন এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন? কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্ব্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্ব্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারিনে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দ্দায় তা'র দীপ্তিকে আবৃত ক'রে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দ্দার আড়ালে সত্য-লোকে আমাদের নিয়ে যায়,—সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখেনি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে? শ্রোতারা মনে ভাবছেন বাড়াবাড়ি হচ্চে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুই-মুখো পদার্থ, তার একটা দিক হচ্চে তথ্য, আর একটা দিক হচ্চে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্চে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন ক'রে থাকে সেই হচ্চে সত্য।

আমার ব্যক্তিরূপটি হচ্চে আমাতে বদ্ধ আমি। এই যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাসী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনি এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনি একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় ক'রে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালি। কিন্তু বাঙালি কী? ও তো একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের

পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র,—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি, এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ, এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনি বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্চে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্চে প্রকাশ, এই জন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্চে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হোলো আমার সীমার দিকের কথা, এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন; আমি মানুষ, এটা হোলো আমার অসীমের অভিমুখী কথা, এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ্য ক'রে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্য বস্তু; এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হোলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনিনে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটি পুনরাবৃত্তি করে, তাহোলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, "না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী?" অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার

কোনো সম্বন্ধ অনুভব করিনে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল, অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, তাতে আমার কী? কারণ সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইনে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলি-বেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হোত তাহোলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হোত; আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন সে সময়ে বালিকার ক্ষিদে পেয়েছিল, এবং মনে মনে মিষ্টান্ন-বিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ কবির কাজ নয়। এই জন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সঙ্গীতের বাঁধনে ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন, তখন বর্ণ ও রেখা-সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে

ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে তার ল্যাজের শেষ পর্য্যন্ত হিসাব ক'রে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হোলে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কা কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তাহোলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর ঘোড়া যদি উপলক্ষ্য হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তাহোলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী? না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ। এই রকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা গীতের সুষমা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে, যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তাহোলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁৎ হয়, তাহোলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জ্জন করেন।

জাপানী কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্ত্তির সামনে সূর্য্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে একথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিদ্যার খবর দেবার জন্যে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ে তথ্যের মজুরী করে তারা কি ওস্তাদ?

অতএব রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের

দাসখৎ থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই :—

"খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।"

জুতা জিনিষটা তথ্যের কোঠায় পড়ে—এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক, বিলিতী দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এই জন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হোলো। তাতে আমাদের শব্দাম্বুধি বিক্ষুব্ধ হোতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান-নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইসারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গী।

জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে :—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।"

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন? ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার আছে, রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়? আর চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে? আবার যৌবনের বন কোন্ দেশের বন? সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে? যাঁরা তথ্য খোঁজেন, তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে, যে,

নির্দ্দিষ্ট শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই :—

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্চে এই :—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হারামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠ্‌ল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বল্‌লেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্ম্মিক খ্যাতিমান্ লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন,—"এ তো ছেলে-মেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ ক'রে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হোলো। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা প'ড়ে গেল। হায়রে কবি, একে তো ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম্ম,

তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তাহোলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা হোতে পারত। তথ্যের দিক্ থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত, তবে কখনই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না, রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত; কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিণী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না,—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারীর জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উল্টোপাল্টা কাণ্ড!

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপর্য্যাপ্ত হোক না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদিবা লিখে বসে, তাহোলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ু রক্ষা হয় না। অতএব রসের জগতের আলোক-রশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে

প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে :—

জনমঅবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আহ্নিক বলছেন লাখ লাখ যুগ পূর্ব্বে ডারুয়িনের মতে ডাক্তারের পূর্ব্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হোলেও রুচিবিরুদ্ধ। যা হোক সোজা কথা হচ্চে ডাক্তারের কুষ্ঠিতে লাখ লাখ যুগের অঙ্কপাত হোতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও এ কথা জানে। ডাক্তার যে, সে তো সেদিন জন্মেছে ; কিন্তু বন্ধু যে, সে যে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো এককালে ছিল না, আর কোনো এককালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পংক্তি মনে পড়ছে :—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে, গুণে, রসে, প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হোলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু রসসত্যের ক্ষেত্রে যে প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।

অতএব কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে :—

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ ॥
বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল রবো তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে ॥

সৃষ্টি *

আজ এই বক্তৃতা-সভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্চি তখন শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার গলিতে শানাই বাজছে। কী জানি কোন বাড়ীতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান সহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে? সে কেবল স্বরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আফিসের প্রয়োজনে লোহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না—যেন দর দাম কেনা বেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হোলো না, পর্দ্দাটা তুলে দিলে—এই ট্রাম চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক ডাকের পর্দ্দা। বর-বধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।

---

* ১৩৩০ সনের ২০শে ফাল্গুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনা বেচার জগতে বর-বধূরাও তুচ্ছ, কেই বা জানে তাদের নাম, কেই বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়? কিন্তু রসের নিত্যলোকে তারা রাজা-রাণী। চারিদিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ ক'রে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এই জন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান, তাদের মূল্যের সীমা নেই, তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

এই বরবধূ, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা মহারাজার চেয়ে কম সত্য নয়, সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন ক'রে রাখে। কিন্তু সেই নিত্য পরিচয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো না কেন, এককালে তপোবনে থাকত একটি মেয়ে, সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্যতার কুহেলিকায় ঢাকা। তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর একদিন রাজা তাকে ত্যাগ করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাইতো রাজা নিজেকে লক্ষ্য ক'রে বলেছে: "সকৃৎ-প্রণয়োঽয়ং জনঃ।"—রাজার সকৃৎ প্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্ছিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে দেখবার, মনে ক'রে রাখবার, এত সময় আছে কার? কাজ কর্ম্ম তো থেমে থাকে না, কেনা-বেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক'রে দাঁড় করালে কে? সেও একটি কবির বাঁশি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে

থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিণী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্ত্তন হয় সে কি আমরা দেখিনে? রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজ-পুত্র ব'লে তার মূল্য? তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম? তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়? সত্য-যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত? সেই রাখাল বেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে? সে তো কবির বাঁশি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে? তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিক্ষু যে অখণ্ড সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো জুলিয়েটকে যখন সাহিত্য-ভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড় দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কতদূর, এমন কি দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা? তারা সত্য এই মাত্র তাদের মহিমা, সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দোঁহে মিলে যদি দশাবতারের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য্য অর্থ উদ্ঘাটন করতে পারে তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্য-কলার রথে তুলে তথ্য সীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে

মূল্যবান হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির দাম পাঁচ দশ হাজার টাকা হোতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই দামকে আমরা দাম ব'লেই মানিনে—সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রস-লোকে তথ্য বন্ধন থেকে মানুষের এই যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি! এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে, আপন সত্য ঐশ্বর্য্যকে হাট বাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে, তার নি-কড়িয়া ধনকে নি-কড়িয়া বাঁশির সুরে গেঁথে রেখেছে। আপনাকে আপনি বারবার বলেছে, ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।

আমি কী বোঝাব তোমাদের কা'কে বলে সাহিত্য, কা'কে বলে কলাচিত্র? বিশ্লেষণ ক'রে কি এর মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি? কোন আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্ত্তে তা বোঝা যায় যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই, এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইসারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, আনন্দ-ধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ। একথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকাল বেলায় প্রভাত-কিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী? না নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যা-মেঘে অস্ত-সূর্য্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজ সজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে? আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই—আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত

আকাশের রং নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি? সে উত্তর ঐ আনন্দ-ধামের বাণীতেই যদি না লিখি তাহোলে কি গ্রাহ্য হবে? মানুষ তাই মধুর ক'রেই বললে, "আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্ম্মে বাজল, হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্ব্বাণ তারকার প্রদীপ জ্বেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি ক'রে আলো জ্বালতে হবে, যে-আলো নেবে না; মালা গাঁথতে হবে, যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।" মানুষ এমন কথা সাহস ক'রে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বর বধূর সত্য-স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে? আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানী তো বলে অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোদুল্যমান, বলে যা দেখো কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতি-নিপুণ বলে, ঐ যে ললাটে ওরা চন্দন পরেছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতর আছে মাথার খুলি। ঐ যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দ্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক ক'রে তার কোনো জবাব দেয় না, কেবল তার খাম্বাজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বলো, দাঁতের পাটি বলো যত কালই টি'কে থাক্ না কেন—ওরা মিছে; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের সুগন্ধ-লিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে,

তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জ্বল ক'রে ধরে বাঁশি বলছে "সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।"

বুঝলুম, কিন্তু বিনা তর্কে বাঁশি এত বড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী ক'রে? একথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই কেবল ছন্দে সুরে সুসম্পূর্ণ এককে চরম-রূপে দেখানো। সেই একের জীয়নকাটি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চির জাগ্রত চির সজীবস্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে; বরবধূ বললে "আমরা সামান্য নই, আমরা চিরকালের", বললে "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃত লোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।" বরকনে আজ সংসারের স্রোতে ভাসমান খাপছাড়া পদার্থ নয়, আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হোলো সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সঙ্গীত কোনো একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু রূপ যখন সেই সীমা মাত্রাকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।

আজকেকার সানাই বাজনাতেই একথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই একটা তালের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির

হাতে বাজছে, সুরটা খেলো সুর। বার বার পুনরাবৃত্তি, তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছায়াহীন মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মতো। যত ঝোঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সঙ্গীতের আয়তনটাকেই বড়ো ক'রে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্চে—তারই পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল ক'রে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্চে সীমার তর্জ্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দ্দেশ করা। কোনো জিনিষের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হোলো একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য-অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হোতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্চে অতিমাত্রায় ধন জিনিষটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হোতে থাকে। যে-এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবিচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক'রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়—তানের অদ্ভুত কসরৎ, দুন্ চৌদুনের মাতামাতি, তার-স্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা। এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি

দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে আমাকে দেখো। কেন দেখব? জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব ব'লেই এসেছি। কিন্তু জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের ক'রে বলছে এইতো সত্য, রূপ জগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে ঐ তো আমার সত্য। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কস্‌রৎকে বলি ধিক্।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনো তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুসি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অম্লশূলরোগীর সেবার জন্য সেই মেয়েদের পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্য কলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক, তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে—তাদের মুক্তি নেই। কারণ রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হোলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। যারা ফর্ম্মা গণনা ক'রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা প'ড়ে কবরস্থ হয়।

কলা-সৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ কর্‌বার সমস্যা হচ্চে রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না এই অনুশাসন গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বলো, আর কলাসৃষ্টিই বলো। রূপকে মান্‌তেও হবে, নাও মান্‌তে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য্য কতকগুলো কল,—হজম করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল। এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম

একটা লজ্জা আছে। তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন। আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্ত মাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের, এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয়। মাংসপেশী খুবই দরকারী—তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুগ্ধ হলুম কখন? যখন আমাদের সমস্ত দেহের সঙ্গীতকে তারা গতিলীলায় প্রকাশ ক'রে দেখালে। মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের বলেন তোমাদের প্রশংসা আমি চাইনে—কেননা সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জান্‌লে। তবে কী জান্‌ব? আনন্দ-রূপে আমাকে জানো। ভূস্তর সংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলা-লিপিতে তার নির্ম্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে। মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন। কিন্তু উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন আনন্দ নিকেতন সেইখানেই তার সূর্য্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না, তখন সে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড। বিশ্বকর্ম্মার কী হাতুড়ি ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস! তারপরে কারখানা ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে তারার মালা মাথায় 'পরে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে সভ্যতা তাল ঠুকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানা

ঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালী লেপে দিচ্চে, সেই বে-আব্রু সভ্যতার পরে সৃষ্টিকর্ত্তার লজ্জা দেখতে পাচ্চ নাকি? ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্চে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্য্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে ব্যঙ্গ করছে। উলঙ্গশক্তির এই দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা আপন কলুষ-কুৎসিত মুষ্টিতে অমৃত লোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানব-সংসারে আজকের দিনের সব চেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ অপমান, এই নিয়েই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্চে মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাকে খাটো করে দিচ্চে। মানুষ নির্ম্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠ্‌তে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়! ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধ নিয়ে যায়; যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহা সাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে

শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য দিয়েই সে দম্ভ করছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জাহীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়নি— "পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না; জগতে আনন্দ-লক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।" এই কথা বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, "বরবধূ তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো ক'রে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দুলাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমছে ব'লেই যে সত্য তা নয়, যে সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর চেক বইএর অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে,—গৃহ সজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।"

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম। এমন সময় বাজল বাঁশি। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন, "ব্যাখ্যা ক'রেই যে সব কথা বলা যায়, আর তপস্যা ক'রেই যে সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় এমন সব লোক-প্রচলিত কথাকে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস করো? ব্যাখ্যা বন্ধ ক'রে, তপস্যা ভঙ্গ ক'রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হোলো অখণ্ড; সে তৈরি-করা জিনিষ নয়, সে আপনি ফ'লে-

ওঠা জিনিষ।” ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিনে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্ত্তিটি যে কী রকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, “এ জিনিষ লড়াই ক’রে তৈরি ক’রে তোলবার জিনিষ নয়; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ’ড়ে ওঠে না। সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক’রে তুলতে চাও, তাহোলে রাত দিন ধাঁও-কষাকষি ক’রে তা হবে না। তম্বুরার এই খাঁটি মধ্যম পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অন্তরে লাভ করো তাহোলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে।” মেনকা উর্ব্বশী এরা হোলো ঐ তম্বুরার মধ্যম পঞ্চম সুর—পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিষটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও? তাই তোমার তপস্যা? কিন্তু স্বর্গ তো পরিশ্রম ক’রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয়নি! স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্ব্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী মুক্তি চাও, একটু একটু ক’রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্ত্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে—সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক’রে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় ব’সে কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে, হোলো না, পেলুম না। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন? যখন সুজাতা অন্ন এনে

দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন? তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল,—সেই পায়স অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠান নি? সেই সুজাতার মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্র সাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে? সেই ভক্ত হৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃ প্রাণের যে সত্য ছিল, সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি, "এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্ম বিহার।" অর্থাৎ মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়, এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায় তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশু-খৃষ্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্ত্তিতে কোথায় দেখেছিলেন? ইন্দ্রদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্ত্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। মার্থা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্থা ছিল কর্ত্তব্য পরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্য-নিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্ম-নিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধ তৈল খৃষ্টের পায়ে উজাড় ক'রে ঢেলে দিলে। সকলে ব'লে উঠ্‌ল এ যে অন্যায় অপব্যয়। খৃষ্ট বললেন না, না, ওকে নিবারণ কোরো না। সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়? গানে কি কারো কোনো লাভ আছে? চিত্র-কলায় কি অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর হয়? কিন্তু রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য্য শুধু তার সাহিত্যে, ললিত কলায় নয়, তার আত্ম-বিসর্জ্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবন যাত্রার উপযোগিতায় নয়,

মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে—তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত। যিশু খৃষ্ট ম্যারির চরম আত্ম-নিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন; তখন তিনি নিজের অন্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন। ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্য্যে প্রকাশিত হোলো। এমনি ক'রেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্য্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্চে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণসংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক—লক্ষপতির কোষাগার নয় পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দম্ভে অভিভূত না করে, কেননা সে সংগ্রহকর্ত্তা নয়, নির্ম্মাণকর্ত্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্ত্তা।

সাহিত্যতত্ত্ব *

আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করিনে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেই জন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিষের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারিনে,

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৩৪০)।

যাতে আমার ঔৎসুক্য, অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে সে, যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশী, তা সে হোক না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক না লাটিম-ঘোরানো। কেননা সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হোলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এ'কেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্চে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। আমি আছি এবং না-আমি আছে এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি ক'রে চলেছে; অন্তর বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হোতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত

দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক এ আলোচনাটা আপাতত থাক, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেই জন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি ব'লেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি ব'লেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যাবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সঙ্কীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ,—সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সঞ্চয়ের ভিড়

জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে চাই-চাইয়ের হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক'রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানিনে।

লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্য্যের আনন্দ। সে কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্য্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই সৌন্দর্য্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্‌ট্‌স্‌কে অধিকার ক'রে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে তার সুষমায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে

অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ অঙ্কের গণিতের মধ্যে যে একটি গভীর সোষম্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয়নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয়নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্ব্বসাধারণের অগোচর। যে ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক বহুলোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠেনি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসঙ্গতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভাবে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে মানুষ তাকে যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয় অনুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা যোগ্য-

তমের উদ্বর্ত্তন তত্ত্ব এ জাতের নয়। এ সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু সে আনন্দটি হওয়ার-আনন্দ নয়, তা পাওয়ার-আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর মহলের জিনিষ নয়, ভাণ্ডারের জিনিষ।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলেছে বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সৌন্দর্য্যের রস আছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য্য আছে। সৌন্দর্য্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্চে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্ব্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হোতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করচে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁখে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তাহোলে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্য্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু এই শিল্প-সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারিদিকে ফাঁকা এনে দিল। যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিষকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয় শিল্পকলার সাহায্যে, বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই,

যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কা'কে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা; বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্ত্রা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধূলোমাটি পাথর লোহা'য় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চারদিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্ব্বচনীয়। সেই প্রাণ-শিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে রং নিয়ে তাপ নিয়ে চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্চে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি, এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল, যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য, যে-সৃষ্টিতে জানা নয় পাওয়া নয় কেবল হওয়া। পূর্ব্বেই বলেছি অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই সকল কাজে বেগ সঞ্চার

করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্ম্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগরসঙ্গমে পর্ব্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়। লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্ব্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, সেখানে আমরা আপনার মধ্যে পরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিত-ব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জ্জন করতে, সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও

সঙ্কোচ নেই। কেন-না সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, আমি ধনী এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গী সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হোতে হয়, কিন্তু যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্য্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্ব্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি, তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু সৌন্দর্য্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে, তার হিসাবের আদর্শ নেই পরিমাণ নেই।

ঊর্দ্ধ আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্য্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে "ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্ব্বচনীয়তায় পরিণত ক'রে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এই জন্যে সে যখন বলে "চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে" তখন

তাকে পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারিনে। এই জন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদীর উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক'রে বলা যাক্ না, শব্দের নির্ব্বাচনে ভাষায় ভঙ্গীতে ছন্দের ইসারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকে সেইখানে যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্চে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে, কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্নই নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে, যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে; যেমন ক'রে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্ত্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায় শব্দের ভাষায় তারি সম্বর্দ্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক সাময়িক, বর্ত্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই

পায়নি যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্না রাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান,—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখীর সেই গান, যে গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে :—

Listen Eugenia,
How thick the burst comes crowding through
the leaves.
Again—thou hearest ?
Eternal passion !
Eternal pain !

পূর্ব্বেই বলেছি রস মাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতো-বিরুদ্ধ। দুঃখকে ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য্য মনে করি তার কারণ তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হোলে সেটা দুঃসহ হয়। এই জন্যে দুঃখ-বোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয় প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে? কোনো দুর্লভ ধন অর্জ্জন করবার জন্যে নয়,

ভয় বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হোতে দেখা যায়, কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হোলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না, তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হোলেই দেখা যায় হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের—নিজের কোনো বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই মানুষ নিন্দা করে যে তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করেনি তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলেবলে নিন্দা-সাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য্য কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হোতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্রবোচনায় রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয় একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি

গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমেছে কত, আনন্দ পাচ্চে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়-হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দ্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতন ভরে
শয়ন 'পরে ;
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তা'রে গোপন ঘরে
যতন ভরে।
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,

ঘুমে জাগরণে মিশি' একাকার নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশ বশে।
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রসিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।" বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়? মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেন-না বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে, আমি আছি। বিরহের শূন্যতায়

যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি "অয়মহং ভোঃ"। এই যে আমি আছি, সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না এই যে আমিও আছি। দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে আমি আছি এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তাহোলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, আমি আছি। আমি আছি এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে? এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তি-পুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং, তাহোলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয় ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার "কৃষ্টি"র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যক করে তুলেছে, সে আপনিই

হয়ে উঠেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, "আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।"

ক্লাস ঘরের দেয়ালে মাধব আরেক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে "রাখালটা বাঁদর।" খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্চে মাধব রাগ করেছে, যা মাধব চাচ্চে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ু দত্তও বাঁদর বই কি, কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ-গোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানব-চরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অমন

অবিমিশ্র দুর্ব্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল ; বলেন যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ হিড়িম্বা বা শূর্পনখা নারী,"মায়ের জাত", এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় কেবল এই জবাবটা পেলেই হোলো যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্ত্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে এর গলাটা না-গোরুর মতো না-হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ ভাগের ঢালু ভঙ্গীটা সাধারণ চতুষ্পদ সমাজে চলতি নেই অতএব ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্য্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ; ও বলছে আমি আছি, না থাকাই উচিত ছিল বলাটা টিঁকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল ; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখীরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহী নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্ব্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্‌,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শ-যোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকা সত্ত্বেও।

ডালিম গাছে পরভু নাচে,
তাক্‌ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে উঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিষ, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ, সে আছে সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে গল্প বলো, সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব। গল্প সুরু করা গেল :—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।

গাঁ গাঁ ক'রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
ঢেঁকিশালে মাসি ধান ভানে
বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, "চাই গ্লিসেরিন সোপ!"

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক'রে হাঁ ক'রে শোনে। আমি বলি আজ এই পর্য্যন্ত। সে অস্থির হয়ে বলে, না, বলো তারপরে। সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরি 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবী গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা ক্ষ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না-নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সৌন্দর্য্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্য্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। যেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন

কি সাধারণ সৌন্দর্য্যের চেয়েও তার আনন্দ-জনকতা হয়তো গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্বুদ্ধ করে। "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন" মধুর হোতে পারে কিন্তু "বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী" মনোহর। একটা কানের আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর-প্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হোতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত, ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয় তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিষকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্ত্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টি-মন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্যসদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই

বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আস্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত আমি বিশেষ, অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্য্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই এবং তার অনুবর্ত্তী যে বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক অনুভূতির বাইরে।

পূর্ব্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান, সে-পদার্থ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে; চালতা ফুল এখনও কাব্যের দ্বারের কাছেও পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্য্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্ব্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হোত তাহোলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগী পাখীর সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হোলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না।

রাত্রে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হোলো অনুপস্থিত। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয়নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় ছিলি! সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হোলো প্রত্যক্ষ, সে হোলো বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্ব্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিল্ল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হোলো বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধূম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদ-বীথিকায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক্, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে মেয়ের বিয়ে নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কন্যার বিবাহ নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আশুম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তার ভাষায়

ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন তাহোলে প্রতিদিনের হাজার লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক'রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমার-সম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাঙ্কোপাঞ্জা ডন্‌কুইক্‌সোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জ্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণশ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে? ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্চে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্য্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এ চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্ত্রলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য, কিন্তু যুদ্ধে পঙ্গু একটি মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল, যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্চে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ নামক একটি মাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জ্বলন্ত অঙ্গার

বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে, কারণ সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে, সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম্ম শব্দের মোহ-যবনিকার অন্তরালে যে সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেণ্টের আমলাতন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে, সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়-সম্পর্কহীন নামের নিচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দ্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকা ক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলেছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব, এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত, আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে, আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে, তার বর্ত্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়-মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত, সত্যরূপে কেবলি তাকে ছাড়িয়ে যায়,

কোথাও থামতে চায় না। তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই সকল রূপ-সৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্চে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্য-পুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তায়।

সাহিত্যের তাৎপর্য্য *

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হোতে হোতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হোতে হোতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৩৪১)।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্চি, তা ছাড়া জানাচ্চি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে মন্দ লাগছে রাগ করছি ভালোবাসছি এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে থাকতে পারিনে। মূক পশুপাখীরও আছে অপরিণত ভাষা, তাতে কিছু আছে ধ্বনি কিছু আছে ভঙ্গী—এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায় কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবামাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা "আমি আছি" এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি.

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুসি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল, তাতে সে আশু উদ্বেগের প্রবর্ত্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দ লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্য-জগৎ ক'রে নিলে।

ব্যবসাদার গোলাপজলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্য্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপজলের কারখানাটা

সাহিত্যের সামগ্রী হোলো না। হোতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎ কালের সন্ধ্যা সূর্য্য মেঘস্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বস্ব-দান পণ ক'রে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্ব্বচনীয় শান্ত রসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্ত্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গীতে তখনি তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জল-যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্ত্তেই তপসি মাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিঃশ্বাসে বলে উঠল, ওঃ মস্ত মাছটা! মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্চে রান্নার জন্যে এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল, চারদিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্চে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া,—নদীতীরে সেই সূর্য্যাস্ত-আলোকে

মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল ক'রে—এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে? এই আশ্চর্য্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। ভর্তৃহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এই মাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ—মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে—সাহিত্য তারি একটি বড়ো পথ।

সদ্যতৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম করা। তার চারদিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেষের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তা'র বালির বাঁধন কিছু কিছু খস্‌তে থাক, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে,—তখন ধীরে ধীরে বনপ্রকৃতির রং লাগবে এর সর্ব্বাঙ্গে, চারিদিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হোতে থাক্‌বে। বিষয়ী লোক আপনার চারদিকের সঙ্গে মেলে না; সে আপনাতে আপনি পৃথক, এমন কি জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র, মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে

থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে—নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানী এসে দাঁড়াল ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না, সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্ব্বত যুগে যুগে মানব-মনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে, সেটা প্রকৃতির নয় সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয় তা মানবিক, সেই জন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়—তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্ব্বত্রই। মানুষেরা সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা রসের অনুভূতি প্রবল হোলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয় হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনি বিশ্বের যে কোনো

বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনি আর যন্ত্রের দেখা থাকে না, ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তা'র থেকে তা'র স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্ত্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছুবা বলে কিছুবা গোপন করে, কিছু বার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হোতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন, "দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।" দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিষ ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হোলো যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, "দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।" আগ্রহ যে পাখীর মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্চি :—(ইংরেজি তর্জ্জমার থেকে)—"আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরু ঝুরু বইছে শরতের হাওয়া। থর থর ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে—চড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো।" এই যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্ম্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীন দেশীয় কবি বলছেন :—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে ;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই ;
বালি ধূ ধূ করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার বন ;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার ;
গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটা পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখ বেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে ॥

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্ব্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী ক'রে? নদী পর্ব্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিষ তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিষ হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্চে কল্পনাশক্তি ; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে

আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক্ এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিষ নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে "কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে" তখন বুঝতে হবে যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয়নি—সেইজন্যে "হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।" মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারেনি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয় তখনি তার ভাষায় সুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে একান্ত ক'রে স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্ব্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ ভাবে, আমাদের সঙ্গে তাদের যে ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এই জন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপনভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে সম্পর্ক ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তাহোলে তাকে আমরা মানব-ভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো ক'রে দেখতে পারিনে। নিত্য ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিস্-কেস্ রূপেই আমাদের

চোখে পড়ে,—ঘৃণার সঙ্গে ধিক্কারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জ্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববনদাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে—সেই দূরত্ববশত সে অকর্ত্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্ব্বতকে সরোবরকে। কিন্তু যদি খবর পাই অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্চে, দগ্ধ হচ্চে শত শত মানুষ পশুপক্ষী তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনি আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানব ঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাইনে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্য সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু এই ঘটনাটি তার পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী দূর শাখা-প্রশাখাবর্ত্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে,—আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই—এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে দিয়ে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন, সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোনগুলি সার্থক, কোনগুলি নিরর্থক তা আমরা বাছাই ক'রে নিতে পারি নে। এই জন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখনি সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের

সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘট্‌ছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই বা দেখতে পেয়েছে, কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে,অনেক অত্যুক্তি অনেক ঊনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে ; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হোতে বাধা পায় না, এই জন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্ত্তমান কালেই আমাদের দেশে চারদিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারী শাসনতন্ত্রের বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশুবিলীয়মান মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি —যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য্য সমস্ত বেদনা সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠ্‌বে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের বই পুলিসের যষ্টি সমস্ত হবে গৌণ, তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটো বড়ো দ্বন্দ্ব-বিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানব-মনে বিরাট মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানস জগৎ,

বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হোলো তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশ-বৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে গল্প বলো, সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষ্যায় তার বিঘ্ন, এ সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপ-কথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্চে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব; বস্তুত তারা মানুষ, ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎরূপে দেখা দেয়, শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা, তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না। মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে, তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানব সংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য ক'রে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হোলো, রচিত হোলো মহাভারত। রামকে

পেলুম, সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে সমস্তই দানা বেঁধে উঠ্‌ল রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠ্‌লেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্য মানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে, আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহুলোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে, তারা আসে তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হোতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখন তাদের আর ভুলতে পারিনে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ্‌ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ্‌ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি, তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হোতে পারে সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ্‌, তারা শ্রেণীগত, তাই তারা একই জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হোলে তাতে আর্টিষ্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিষ্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না। এই সৃষ্টিতে যে মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হোত তাহোলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত, সে বাস্তব যদি হোত, তবু সত্য হোত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হোত না। শতদল পদ্মে যে ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্ত্তেই বলি সুন্দর তা সহজ—তার সঙ্কীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন কিছু নেই যা অযথা; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তাহোলে আর্টিষ্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ বাস্তবে যা আছে বাইরে, তাকে পরিণত ক'রে তুলতে হবে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জ্জন করতে হবে কল্পনার নির্দ্দেশ মতো। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে, কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন ক'রে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হোতে পারে।

প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্ম্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে, সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে তাকে দুই দিক থেকে কেবলি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে,—ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে, আকাশের আলো যেখানে অগোচর, সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে, প্রকৃতি আপনি যে ফলমূল ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অস্বচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্ব্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি; সে নিজের সুবিধা ও রুচি অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্ম্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি, তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী ক'রে তুলছে—সে জন্যে তার কত কলবল, কত নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য। এখানকার জলেস্থলে আকাশে মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত ক'রে দিচ্চে। উপকরণ পাচ্চে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা ক'রে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্চে। মানুষের নগর-পল্লী শস্যক্ষেত্র উদ্যান হাট-ঘাট যাতায়াতের পথ প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবার নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে, এমনি ক'রে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ ক'রে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের

এই একটা পালা বস্তুজগতে ; ভাবের জগতে তার আছে আর একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়স্তম্ভ, আর একদিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেইদিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি ; অর্থাৎ তার চারদিকে যা তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে যাতে সে মানুষের মনের জিনিষ হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি ? হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে ; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি, সেই উপলব্ধি করা সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়।—দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলছি জ্যোৎস্না-রাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার, দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গীতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি, সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন, পাখীর বাসায় হঠাৎ পাখা-ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝরঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠ্‌ছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারি দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক, বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়, বহু-প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রির একটা স্বরূপ

দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্না-রাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিষ। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ ফুল অসামান্য, সে আপন সৌন্দর্য্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু যা সামান্য যা অসুন্দর তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি ক'রে বিরক্ত করছে, এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, এ'কে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্ব-গৌরবে দেখি তাহোলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্য জগতে।

বস্তুত আর্টিষ্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এই রকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে ; বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিষ্ট অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্ব্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য।

ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয়, এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক্। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে, সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হোলো।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হোলো তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হোলো রামচরিত। অর্থাৎ এমন কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্ম্মাণশক্তি বলশালী,আশ্চর্য্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে এই নৈপুণ্য নিয়ে সে বড়ো বড়ো নগর নির্ম্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্ত্তি যেন মানুষের গৌরব করবার যোগ্য হয় এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি, যাদের শক্তি আছে যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়—মুনফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত বিকৃতরুচি বর্ব্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে, তাই নির্লজ্জ নির্ম্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুর্দ্দৃশ্য বস্তি পাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত

আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্য্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি, তেলকল, নোংরা দোকান, গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্ব্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপে এই সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে একথা মানতে হবে, যে, সমস্ত সহরটা সহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বল্‌বে না সহরের সত্য তার কদর্য্য বিকৃতিগুলো। কেননা সহরের সঙ্গে সহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ, সে-যোগ স্থায়ী যোগ, সে-যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে-সেখানে, কিন্তু তবু সকল হীনতা দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে' যে সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ম্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তাহোলে লজ্জা পেতে হবে, কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো, তারি থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

সাহিত্য-ধর্ম্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র এই তিন জনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুতঃ রাজকন্যা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ—ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা-নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব

ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজ্‌দার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, "তুমি কেন?" সে বলে, "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট"। রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে। কাঠা-বিঘের দরে তার বেচা-কেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে-অখণ্ড আকাশে—তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নিচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানব-কীটও আছে—আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্ত্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন:—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপ-বিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে-অনির্ব্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আট্‌কে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্ততঃ চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হোলো সাহিত্যের।

অলঙ্কার জিনিষটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা,—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে-সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত ক'রে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলঙ্কার, কণ্ঠের সুরে অলঙ্কার, হাসিতে অলঙ্কার, ব্যবহারে অলঙ্কার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলঙ্কৃত বাণীতে। সেই বাণীর সঙ্কেত-ঝঙ্কারে বাজতে থাকে, "অলম্"—অর্থাৎ "বাস্, আর কাজ নেই।" এই অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্চে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হোলো এক, আর সার্থক সত্য হোলো আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ "লাখে না মিলল এক।" করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাচ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা ছন্দ অলঙ্কার। যথার্থ সত্য-যে বস্তুতই ছিল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নেফুলে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা

ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নে-মঞ্জরী পরতে দ্বিধা করেন, বকফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হোত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলঙ্কার মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেননা পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয়নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগত তাহোলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হোত। তিসিফুল শর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি ব'লেই কবি-কল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষফুলের সঙ্গে গোলাপজামফুলের রূপে-গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল, কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজন-লোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি অমৃতে অনটন ঘটে না ব'লেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখী ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়, কিন্তু রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হোলো। সকল ব্যবহারের অতীত ব'লেই মকর বেঁচে গেছে—ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হোলো না, নির্ব্বাচনের সময় রুই কাৎলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম ব'লেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারিনে। কেননা লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন

ব'লে বেছে নিলেন তার দৌর্ব্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচুগাছ আঁক্‌তে রূপকারের তুলিতে সঙ্কোচ নেই। কিন্তু বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুস্কিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় "বেণুবন" ব'লে সাম্‌লে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানাভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে "কুর্‌চি" ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্ততঃ করেছি, কিন্তু কুর্‌চিফুল আঁক্‌তে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ-কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক্ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হোলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্ত্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে কার্পেট পেতে তার উপরে নিজের সাধ্যমতো সর্ব্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে, তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হোতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে-যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে—এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলঙ্কৃত।

জীবধর্ম্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশ-

রক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক্, সাহিত্যে ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয়নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।

স্ত্রী-পুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়, কেননা ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্ম্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীর-বিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা "প্রজনার্থং" নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবী ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মাম্‌লা চলছেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক

থেকে। বংশরক্ষাঘটিত-পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হোলো বিজ্ঞানের কথা— মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল এ-কথাও বিজ্ঞানের, সংসারে এ-কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় সেইটিই হোলো বিচার্য্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্যকারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত ক'রে দেয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হোতেই পারে না—দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান্ যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য-সূর্য্য তারি কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাক্‌লেও প্রতিমুহূর্ত্তে সূর্য্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্য্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্চে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী

ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হোলো। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখানকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে তার পক্ষপাত ধর্ম্ম;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্ব্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব-যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন্ যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁক্‌তে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিষটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসা-কাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিষ নয়,তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রং নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার

চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-সহর কল্‌কাতার বাবুমহলে কী রকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না;—পেটুকতার নীতি-বিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট্‌-পরা গুলি-পাকানো ধূলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে রাস্তার ধূলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন্ করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য্য-কারণ বহু যত্নে বিচার্য্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্চে এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক-রকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

উপসংহারে এ-কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন-মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবী করছে, সে-দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্ল্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!" ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী!"

১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্চে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক'রে তোলা, যেখান থেকে দাবী আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে সব সাহিত্য বনেদি তারা বহুকালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদী সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরী ক'রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরী হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয় পূরো নিয়ে। তাদের আধা-র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলা দেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হোলো যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক না, তার বলবার আদর্শটা সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে আদর্শটা আছে যে-হেতু তা সার্ব্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্ব্বাংশেই বিদেশী—কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার

ক’রে নিতে বাধা পায় না। শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়,—সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্ব্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হোলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়;—সেটা পারিবারিক ভোজ হোতে পারে, স্বজাতের ভোজ হোতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু মানুষের কানের কাছে সর্ব্বদাই যারা ভিড় ক’রে থাকে, যাদের ফরমাস সব চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে, তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবী অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্য্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে যে-আলোটা ল্যাম্প্-পোষ্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

যে-লোকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তাহোলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তাহোলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক’রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু তাই ব’লে একথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ য়ুরোপে সকল সময়েই

সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গরজের ফরমাস যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্ব্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিয়লজির গোল্‌ড্‌ মেডালিস্‌ট্‌ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধর্ন্না দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্চে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কন্ধকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াহ্নে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব'লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে—কেননা যা-কিছু সহজ তাতে তার আর সানায় না। যে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দ-সম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর, সেই শক্তির ক্ষীণতায় উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে। তখন মাৎলামিকেই পৌরুষ ব'লে মনে হয়। প্রকৃতিস্থকেই মাতাল অবজ্ঞা করে, তার সংযমকে হয় মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্ব্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্চে অপূর্ব্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হোতে চেষ্টা করে তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্চে পাঁকের মাতুনি,—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যায় ঘটিয়ে,

ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্। এর একটিমাত্র কারণ হচ্চে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি এ-কথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না ক'রে লোকে যখন গর্ব্ব করতে থাকে তখনি বুঝি সর্ব্বনাশ হোলো ব'লে।

য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে,—যেমন ক'রে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্ব্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্চে এই যে, আমাদের শাস্ত্রমানা ধাত। এই রকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর-কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি প'রে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল মাষ্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধূর পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুল বয় ব'লে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাষ্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেডমাষ্টারের গদগদ ভাষার অর্থ কী ও তার কারণ

কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হোলো আধুনিক কালের আপ্তবাক্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি একথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর, সে সার্কাসের খেলোয়াড় হোতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্য্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্চে—বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।

কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্ত্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্চে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে;—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের

পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাউডর।" ওর মধ্যে একটা হচ্চে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য-বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। "আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কা'কে বলে লাইফ্" এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চল্‌তি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মতো হয়ে উঠ্‌ছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় "দরিদ্র-নারায়ণের" ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেননি;— ভালোরকম উপার্জ্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন;— দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্ব্বদাই ঝালমস্‌লার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্ব্বে স্থান পায়নি বা এর পরে স্থান পাবে না এমন কথা সত্যের খাতিরে বল্‌তে পারি নে। কিন্তু ও জিনিষটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুল্‌ছিনে! বিপদের কারণটা হচ্চে, ওটা অত্যন্ত শস্তা—ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধুলোয় যার লুটোতে সঙ্কোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এইজন্যেই, পাঠক-সমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত

উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদী তাহোলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরী করবার নেশা যাদের লাগ্‌বে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিষ। কিন্তু সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোনো-কিছুকে কেয়ার করিনে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিষ হচ্চে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো—প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না-ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল একজায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্চে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্ব-শক্তির প্রয়োজন করে না,—কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না এ কথা বলব না, কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিষ হয় তাহোলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে এমন-একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে? যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই, তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্য ভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তাহোলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা অসীমের মধ্যে

নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা—খণ্ড দেশকাল পাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হোলে মাকাল দিতে পারিনে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম, এবং দিয়ে যদি বাহবা পাওয়া যেত তাহোলে শস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালো রকম বিদ্যাশিক্ষার জন্যে মানুষকে নিয়ত যে প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয় তাহোলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহঙ্কার করতে পারে। এই রকম শস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ্য সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে দুর্ব্বল করাই হয়। বীর্য্যসাধ্য সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্য ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হোতে পারে—বিশেষভাবে যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এই রকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তাহোলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই সব তরুণ লেখকের মধ্যে

নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এই রকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় আমরা কিছু মানিনে,—এটা তরুণের ধর্ম্ম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে—সেই শক্তির অহঙ্কার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহঙ্কারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে—সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্দ্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু যেখানে না মানাই হচ্চে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের শস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানিনে যদি বলতে পারি তাহোলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে, তাহোলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্লানসিউস্ জাহাজ
২৩শে আগষ্ট, ১৯২৭

কবির কৈফিয়ৎ

আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

এতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিষকে আমি যদি বলি নৌকাচালানো আর তুমি যদি বলো দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বলো রামরাবণের-লড়াই তা নিয়ে আদালত করবার দরকার ছিল না।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, কথাটা ব্যবহার করতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হয়। জীবনটা কেবলই লীলা! একথা শুনলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দল কী বলবে যারা তিন ভুবনে কেবলি তাল ঠুকে লড়াই করে বেড়ায়।

আমি কবুল করি আমার এখানে লজ্জা নেই। এতে আমার ইংরেজি মাষ্টার তাঁর সবচেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারতে পারেন—বলতে পারেন ওহে, তুমি নেহাৎ ওরিয়েন্টাল।—কিন্তু তাতে আমি মারা পড়ব না।

"লীলা" বললে সবটাই বলা হোলো আর "লড়াই" বললে ল্যাজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়? ভাঙ-খোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টেনে একী হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা? কেনরে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই?

বাঁচবার জন্য।

আমার না-হক্ বাঁচবার দরকার কী?

না বাঁচলে যে মরবে।

না হয় মরলাম।

মরতে যে চাও না।

কেন চাই নে?

চাও না ব'লেই চাও না।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচবার একটা অহৈতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে ব'লেই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মেনে নিই। সমস্ত জোরজবরদস্তির সবশেষে একটা খুসি আছে— তার ওদিকে আর যাবার জো নেই, দরকারও নেই। সতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা,—মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে, খেলার আনন্দ না থাকলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর কিছু নেই। এমন স্থলে সতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বলো দাবাবড়ের লড়াই তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বললে এমন কথা আমি মানব না।

কিন্তু এ সব কথা বলা কেন? জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা একথা শুনতে পেলেই যে মানুষ একদম কাজকর্ম্মে ঢিল দিয়ে বসবে।

এই কথাটা শোনা-না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা-না-করা নির্ভর করত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন গোড়ায় তাঁরি মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নেই।

কেন, সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন কী?

তিনি আর যাই বলুন লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন।

মানুষের বিজ্ঞান বলে জগৎ জুড়ে অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হয়ে ফোটে, তারা হয়ে জ্বলে, নদী হয়ে চলে, মেঘ হয়ে ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হোতে পারে কিন্তু তা কবির সত্যও নয় কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্ত কবির কথা রেখে দাও, তুমি নিজের হয়ে বলো।

আচ্ছা ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই সব কথা আমার কাব্যে বারবার এসে পড়েছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝতে হবে একটা কোনো সত্যে আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত আমার আর এড়াবার জো নেই। অতএব এখন থেকে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হয়ে এক কথা হাজার বার বলব। যদি আমাকে বানিয়ে বলতে হোত তবে ফি বারে নূতন কথা না বললে লজ্জা হোত কিন্তু সত্যের লজ্জা নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নেই। এই জন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহঙ্কারের মতো শোনাচ্চে।

সত্যের দোহাই দিয়ে নিন্দা করলে যদি দোষ না হয় তবে সত্যের দোহাই দিয়ে অহঙ্কার করলেও দোষ নেই। অতএব এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হোলো।

বাজে কথা এল। যে কথা নিয়ে তর্ক, সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করে দেখা

অবচ্ছিন্ন দেখা,—অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়ে সুরের কসরৎকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলতে চান জগতে পাপ নেই, দুঃখ নেই, রেষারেষি নেই? আমরা তো ঐ গুলোর উপরেই বেশি জোর দিতে চাই নইলে মানুষের চেতনা হবে কেমন ক'রে?

উপনিষৎ উত্তর দিয়েছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত (অর্থাৎ কেইবা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করত) আনন্দ যদি আকাশ ভরে না থাকত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা ব'লেই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সইতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ তো আছেই কিন্তু তার উপরে আনন্দ আছে ব'লেই সে আছে। নইলে কিছুই থাকত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার করো তখন আনন্দকে বাদ দাও কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব তোমরা যখন বলো হানাহানি করতে করতে যা টিঁকল তাই সৃষ্টি সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাবষ্ট্র্যাকশন্,—আর আনন্দ হতেই সমস্ত হচ্চে ও টিঁকচে এইটেই হল পূরো সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মেনে নিলেম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে এর দাম কী?

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন কি বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়েছে কবিদের মতো সংসারের নেহাৎ অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়িয়ে চলবার জো নেই। আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহৈতুক অনির্ব্বচনীয় ব'লে এসেছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাদের এদেশে প্রয়োজনের হাটের মাশুল দিতে হয়নি। কিন্তু শুনতে পাই পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলে মানতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখে নিক্তিতে মেপে তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করতে চান। সুতরাং কোনো কথাতেই অনির্ব্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েন্টাল বলে নিন্দা করতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয় তবু কাজের লোকদের যতটুকু খুসি করতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবিমাত্র তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক থেকে বলতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে পারি কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। কাষ্ঠবস্তু গাছ নয়, তার রস টানবার ও প্রাণ ধরবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করে যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাই গাছ—তা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়। গাছ যে আনন্দ দেয় সে এই জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার

কোনো বিচ্ছেদ নেই। এই জন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটি দেখতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দ রূপ, সৌন্দর্য্য রূপ। তা কাজ বটে কিন্তু তা লীলা, কারণ তার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে এসে ভেঙেচুরে গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করতে পারল না। কথায় কথায় তাল কেটে যায়। এই জন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ছোটো ছোটো গণ্ডীর মধ্যে তাকে কোনো প্রকারে তালে বেঁধে নিতে চায়। কিন্তু তাতে পূরা সঙ্গীতের রস ভেঙে যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তাল রক্ষা হয় না। এতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব চেয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নেই। পাখী উড়তে শেখে, মা বাপের গান শুনে গান অভ্যাস করে; সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ—বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কী জিনিষ ছিল একবার ভেবে দেখো। মানুষের ঘরে শিশু হয়ে জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে বিশ বছর ধ'রে তার শাস্তি পেতে হবে। এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না ক'রে আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলব এটা বিষম গলদ। কেননা সৃষ্টিকর্ত্তার মহলে বিশ্বকর্ম্মার দলবল জগৎ জুড়ে গান গাইছে—

"মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিসনে কি ভাই ?"

একদিন নীতিবিৎরা বলছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচালে ছেলে মাটি করা হয় একথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখি শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগছে—সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমে বাঁশিই দখল করল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত থেকে জাহাজে করে যখন দেশে ফিরছিলাম দুই জন মিশনারি আমার পাছু ধরেছিল। তাদের মুখ থেকে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্য্যন্ত দূষিয়ে উঠল। কিন্তু তারা নিজের স্বার্থ ভুলে আমার দেশের যে কত অবিশ্রাম উপকার করছে তার লম্বা ফর্দ্দ আমার কাছে দাখিল করত। তাদের ফর্দ্দটি জাল ফর্দ্দ নয় অঙ্কেও ভুল নেই। তারা সত্যই আমাদের উপকার করে কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হোতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগিয়ে দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি কর্ত্তব্যনীতি যেখানে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ অর্থাৎ যেখানে সেটা অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্‌শন্‌ সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তার প্রয়োগ অপরাধ। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং। কেননা দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিললে তবেই তা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য্য হয়েছে যে, আমরা নির্লজ্জের মতো বলতে পারি যে, কর্ত্তব্যের পক্ষে সরস না হোলেও চলে, এমন কি, না হোলে ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! বড়াই করতে হবে যে আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখতে লজ্জা, তাই রাই-শর্ষের বেলেস্তারা মেখে আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক সেখানেই তার আনন্দ, মা যেখানে মা, সেখানে তার ঝঞ্চাট যত বেশিই হোক না সেখানেই তার আনন্দ। কেননা পূর্ব্বেই বলেছি যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উল্টোদিক দিয়ে দেখে বলেছেন অসীম দুঃখ স্বীকার করবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে, হয় নিজের মনিবকে, নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্ম্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর ক'রে মানুষ নিজেকে আর কেউ কিম্বা আর কিছুর মতো করতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতো তার পায়ের মতো নয়, তার পা তার জুতোর মতো। কাজেই পা-কে দুঃখ পেতে হয় এবং কুৎসিত হোতে হয়। কিন্তু এমনতরো কুৎসিত হবার মস্ত সুবিধা এই যে সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নি, কিন্তু নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নেই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করতে হচ্চে। কেমন গোলেমালে দায়ে পড়ে এই রকমটা ঘটেছে। এই জন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলিয়ে বলি, জিন-লাগাম প'রে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় মুখ থুবড়িয়ে মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ সমস্ত দাসের জাতির

দাসত্বের বড়াই। এমনি ক'রে দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হয়ে ওঠে। না, আমরা ঠিকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম বাঁধা মরবার জন্য জন্মাই নি। আমরা রাজার মতো বাঁচব, রাজার মতো মরব।

আমার কথার জবাবে একথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপতে হবে। ততদিন লাগাম প'রে মুখ থুবড়িয়ে মরতে হবে। ততদিন ইস্কুলে আফিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলি নরমেধ যজ্ঞ চলতে থাকবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক ঢোলই খুব উচ্চৈস্বরে বাজিয়ে তাদের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া ভালো—বলা ভালো এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্ব্বাদ—আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা।

তাহোক, বলিদানের ঢাক ঢোল বাজুক আফিসে, বাজুক আদালতে—বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রেখে। মরুক সকলে গলদঘর্ম্ম হয়ে শুষ্কতালু হয়ে লাগাম কামড়িয়ে রাস্তার ধূলার উপরে। কিন্তু কবির বীণায় বরাবর বাজবে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হবে না—Truth is beauty, beauty is truth—এতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া ক'রে এলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজবে—আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—যা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলেছে, ধুঁকতে ধুঁকতে রাস্ত'র ধুলার উপরে মুখ থুবড়িয়ে মরবার দিকে নয়।

১৩২২

বাস্তব

যদি এমন কথা কেউ বলত যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করছে তাতে বাস্তবতা নেই, তা জন-সাধারণের উপযোগী নয়, তাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলতেম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাইরে ফেলতেম।

কিন্তু একেবারে আমারি নাম ধ'রে এই কথাগুলি প্রয়োগ করলে অন্যের তাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি নে।

তবে কিনা, বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক-সভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। সহ্য যে করে তার কারণ এই, একটা জায়গায় তাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর, তার কনেটিকে কেউ হরণ করবে না; এবং যে লেখক, তার লেখাটা তো রইলই।

অতএব নিজের সম্বন্ধে কিছু বলব না। কিন্তু এই অবকাশে সাধারণ-ভাবে সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। সেটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেননা যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরৃদ্দ করা হয়েছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পেল না অথচ দাম দিল এবং খুসি হয়ে হাসতে হাসতে গেল এমন সব হত-

বুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ ক'রে যাদের কলা-কৌশলে ঠকাতে না পারে,—কটাক্ষে যারা বুঝতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নেই। অতএব যাঁরা অবাস্তব-সাহিত্যসম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, তাঁরা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ খুলবার কাজ করছেন।

কিন্তু সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন না কেন চিরকালই তাঁরা পাঠকদের কোলে তুলে সামলাবেন সেটা তো ধাত্রী এবং ধৃত কাহারো পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদেরকে স্পষ্ট করে সমজিয়ে দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোনটা বস্তু নয়।

মুস্কিল এই যে, বস্তু একটা নয় এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি নে। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাকে ফিরতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা ব'লে থাকেন সেটা রস-বস্তু। বলা বাহুল্য এখানে রস-সাহিত্যের কথাই হচ্ছে। এই রসটা এমন জিনিষ যার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয়-পক্ষ ভূমিসাৎ হোলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছেড়ে নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রস-ভারতী স্বয়ম্বর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করে থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক ব'লে জেনেছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগল এবং আমার কোনটা ভালো লাগল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এই জন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নেই। মূলধন না থাকলেও দালালীর কাজে নামতে কারো বাধে না তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেউ সবুর করে না। কেননা সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যারা রচনা করে তাদের উপায় কী? আশু উপায় দেখি নে। অর্থাৎ তারা যদি নিশ্চিত ফল জানতে চায় তবে সেই জানবার বরাৎ তাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলবে না।

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করে নেবার জন্য বহু ব্যক্তি ও বহু দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়ে বিচার্য্য পদার্থটিকে বয়ে নিয়ে গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটা আছে কি না তার উপযুক্ত সমজদার, কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তারাই উপযুক্ত কি না তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁর লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তা ধরে নিতে বাধা নেই। অপরপক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত ব'লে গণ্যই না করেন তবে এমন

বিচারালয় হাতের কাছে নেই যেখানে তারা নালিশ রুজু করতে পারে। অবশ্য কালের আদালতে এর বিচার চলছে কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নেই। এস্থলে কবিরই জিত রইল, কেননা আপাতত দখল যে তারই। কালের পেয়াদা যেদিন তার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি ওপড়াতে আসবে সেদিন সমালোচক সেই তামাসা দেখবার জন্য সবুর করতে পারবে না।

যাঁরা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করে একেবারে হতাশ্বাস হয়ে পড়েছেন তাঁরা আমার কথার উত্তরে বলবেন— "দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাপ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করে তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করবার সুযোগ পেয়ে থাকি।"

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইটেরই বস্তু-পিণ্ড ওজন করে কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করেছে আজও তা বাতিল হয় নি। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হোতে থাকে।

আচ্ছা মনে করা যাক কবিতাকে বাস্তব করবার লোভ আমি আর সামলাতে পারছি নে। খুঁজতে লাগলেম দেশে সব চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব। দেখলেম ব্রাহ্মণ-সভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করে আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়ে খুব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কায়স্থেরা পৈতা নেবেই আর

ব্রাহ্মণ-সভা পৈতা কাড়বেই এই ঘটনাটা বাংলা দেশে আপাতত বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। অতএব বাঙালি কবি যদি এঁকে তার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝতে হবে বাস্তবতা সম্বন্ধে তার বোধ-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝে লিখলেম পৈতা-সংহার-কাব্য। তার বস্তু-পিণ্ডটা ওজনে কম হোলো না কিন্তু হায়রে, সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁর আসন রেখেছেন, না পদ্মের উপরে?

এই দৃষ্টান্তটি দেবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে বাস্তবতা জিনিষটা কী, তার একটা সূত্র ধরতে পেরেছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলেছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হয়েছে সে কেবল "গোরা" উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনেছি প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তার মধ্যে পাওয়া যায়। এর থেকে আন্দাজ করছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব নিয়ে ভয়ঙ্কর রুখে ওঠে। সেটা সম্বন্ধে তার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নেই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্ত্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে আর কিছুতেই অগ্রসর হোতে পারছেন না এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা, তাঁর কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা, স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তা তাঁর নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়, অথবা নিন্দা করি সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নেই ব'লে।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়লিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়ে উঠছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকছিল।

তার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলেন তার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়? ভাবের রাগিণীটি নির্জ্জনবাসী একলা-কবির চিত্ত-বাঁশিতে বেজেছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজন-দরে যা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তু-পিণ্ড তার মধ্যে কী আছে জানতে চাই।

আর কীট্স্, শেলি,—এঁদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়ে নির্দ্ধারণ করো? ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কি এঁরা বকশিষ ও বাহবা পেয়েছিলেন? যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করে থাকেন তাঁরা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করেছিলেন তা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁর দেশ সেদিন ঘরে ঢুকতে দেয়নি এবং কীট্স্‌কে মৃত্যুবাণ মেরেছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন্। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্ম্মের কবি। তাই তাঁর প্রভাব দেশের মধ্যে সর্ব্ব-ব্যাপী ছিল। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হচ্চে টেনিসনের আসনও তত সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। তাঁর কাব্য যে গুণে টিঁকবে তা নিত্য-রসের গুণে, তাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশবস্তু বহুল পরিমাণে আছে ব'লে নয়;—সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধ'সে পড়ছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা

ইংরেজি পড়েছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নয় অতএব তা বাস্তবতার কারণও নয়, আর সেজন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নি তাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেউ তাদের তো কলম কেড়ে নেয় নি। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতে যাব এ তো স্বভাবের নিয়ম নয়।

হয়তো উত্তরে শুনব আমরা হারছি। ইংরেজি যারা শেখেনি তারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করছে, তাই টিঁকবে এবং তাতেই লোকশিক্ষা হবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের? বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়ে রয়েছে, তার মধ্যে ছিটেফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিঁকতে পারবে না।

কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখলে কাজে লাগত, একটা আদর্শ পাওয়া যেত। যতক্ষণ তার পরিচয় নেই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাকে মেনে নিই তবে সেটা বাস্তবিক হবে না, কাল্পনিক হবে।

অথচ এদিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করল, রেগে তাকে গাল দিলেও সে বেড়ে উঠছে; নিন্দা করলেও তাকে অস্বীকার করবার জো নেই। এ-ই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রেগে এঁকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে তার কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখোনি কি, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় ব'লে থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নয়? তাদের কথার ঝাঁজ দেখলেই বুঝা যায় তারা

বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করেছে, আর কোনো মতেই ভুলতে পারছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় ব'লে জানে তারা, ইংরেজই হোক আর বাঙালিই হোক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দেবার ভান করতে থাকে। তাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দুর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগিয়েছে ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। যেখান হতে যেমন করেই হোক জীবনের আঘাতে জীবন জেগে ওঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে এ একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু লোকশিক্ষার কী হবে?

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নয়।

লোক যদি সাহিত্য হতে শিক্ষা পেতে চেষ্টা করে তবে পেতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার নেয় নি। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তার কারণ এ নয় যে তা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়তে শিখেছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব

দিঙ্‌নাগাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখেছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নেই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তব-বাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন —কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এজন্য বলছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটিয়ে থাকেন, কেননা তাঁরা বিশ্বের মিত্র, তাঁরা ন্যায়ের অধ্যাপক নন; শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়লেই সেটা বুঝতে বাকি থাকবে না।

কিন্তু আমি বলছি যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তা সকল-কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রইল, —আজকের সাধারণ মানুষ যা বুঝল না কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তা বুঝবে, অন্তত সে-রূপ আশা করি। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হয়ে লোক-হিতৈষী হতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখতেন,—তাহোলে তারপর হতে এতগুলো শতাব্দীর কী দশা হোত?

তুমি কি মনে করো লোক-হিতৈষী তখন কেউ ছিল না? লোক-সাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী ক'রে হোতে পারে সে কথা ভেবে কেউ কি তখন কোনো বই লেখেনি? কিন্তু সে কি সাহিত্য? ক্লাশের পড়া শেষ হোলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাদেরও সেই দশা হয়েছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প রোমাঞ্চর ভিতর দিয়ে একেবারেই দশম দশা।

যা ভালো তাকে পাবার জন্য সাধনা করতেই হবে—রাজার ছেলেকেও করতে হবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে তার

সাধনা করবার সময় আছে কৃষাণের ছেলের নেই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,—যদি প্রতিকার করতে পারো ক'রে দাও, কারো আপত্তি হবে না। তানসেন তাই ব'লে মেঠো সুর তৈরি করতে বসবেন না। তাঁর সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যা তাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হোতে পারেই না। যারা রসপিপাসু তারা যত্ন ক'রে শিক্ষা ক'রে সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করবে। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব একথা মানতেই হবে। তাই বলছিলাম কোথায় কোন বস্তুর খোঁজ করতে হবে, কেমন ক'রে খোঁজ করতে হবে, কে তার খোঁজ পাবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়াল-মতো এককথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কী? একটা-কিছুর পরে জোর ক'রে তাঁরা তো ভর দিয়েছেন। নিশ্চয়ই দিয়েছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে জন্মে থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রে থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়ে কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যা অনুভব করবেন তার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, এইখানেই তাঁর জোর। পূর্ব্বেই বলেছি বাইরের হাটে বস্তুর দর কেবলই ওঠা-নামা করছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফেশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হবে।

তাঁর অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারীর আদর্শ নয়। তা আনন্দময় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁর কাছে এতই সত্য সেটা কারো কাছে মিথ্যা নয়। যদি কারো কাছে তা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা ;—যে লোক চোখ বুজে আছে তার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নেই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুসি ব'সে যেমন-খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তা খাটবেই এমন কোনো কথা নেই।

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বললেম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তা নয়। তা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তার উপর বাজারে-চলিত-আদর্শের নকলে কৃত্রিম নক্সা কাটা হয়—এজন্য তার সকল অংশ নিত্য হয় না এবং সকল অংশের সমান আদর হোতেই পারে না। অতএব কবি রাগই করুন আর খুসি হউন তাঁর কাব্যের একটা বিচার করতেই হবে—এবং যে-কেউ তাঁর কাব্য পড়বে সকলেই তাঁর বিচার করবে—সে বিচারে সকলে একমত হবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকেন তবে তাঁর প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেই-জন্যই বাইরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত ক'রে হাত পাততে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

১৩২১

সাহিত্য-বিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে "ব্যক্তি" শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউবা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্ব্বত সমুদ্র ভালো জিনিষ মন্দ জিনিষ বস্তুর জিনিষ ভাবের জিনিষ সমস্তই ব্যক্তি,—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হোলো, তাহোলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ—সেই গুণটিই সাহিত্য-রচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে অসংখ্য জিনিষকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাইনে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হোতে পারে কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎ-কর, এমন কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে।

সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্ত্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত ক'রে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী ব'লে নয়, মানী ব'লে নয়, সৎ ব'লে নয় সত্ত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত ব'লে নয়, তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হোতে পেরেছে ব'লেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এই জন্যেই সাহিত্য-বিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না। বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়ো লোক বলি যার বড়ো পদ, বড়ো মানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি, ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সঙ্কুচিত। বাঁধারীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল, তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর, যূথীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্ত ঋতু, তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারিনে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য

রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্চে প্রকাশ। সেই জন্যেই দেখি আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হোলো শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হোলো সাহিত্য-রচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই, নিজের অনিবার্য্য কর্ম্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ ক'রে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্য-রচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দ্দিষ্ট স্থান। কিন্তু বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জ্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি এ যে মারের উপরি পাওনা। বাংলা সাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে, কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউল কবি দুঃখ ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায়, ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই

পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য জুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কিনা কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে-সমজদারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এই জন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্য্যাদা দেওয়া, ধনের মর্য্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নিচে পড়ে। কিন্তু সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র, এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন কি, এখানে বর্ণসঙ্কর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না, তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দির প্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সঙ্কোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র বিশ্লেষণে প্রমাণ হোতে পারে যে তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিস্বটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তাহোলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারিদিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে

তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়—তাতে চিত্তের নির্জ্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে, তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন,—যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যে, দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, "কালো মেঘ আব হেরব না গো দূতী।" অবস্থাবৈগুণ্যে একরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক,—ওটা হোলো খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হোলো ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হোলো য়ুরোপীয়ত্ব; এই ব'লে সাহিত্যে খানাতল্লাসী করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যেব উপরে এক-ঘ'রে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন কাউকে জাতে ঠেলেন তখন একেবারে হতাশ হোতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব্ব এসিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্য্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এসিয়ায় এনেছিল নব জাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্ত্তী এসিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত

না হয়। কারণ, যে কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন ক'রে স্বীকার করতে পারে, তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ব্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় ক'রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতাল পঞ্চবিংশতি, হাতেম তাই, গোলেবকাওয়ালি অথবা কাদম্বরী বাসবদত্তার মতো যে হয়নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্ব্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত,—যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয়, এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরো একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে কিছুদিন পূর্ব্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম ক'রে দলপতিদের চাটূক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্য-বিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসঙ্গত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্চে কুমু মানব সমাজে নারী নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কিনা—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারী-প্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা। মানব-প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে সাহিত্য-বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে আলোচ্য এই—কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ? আলোচ্য-সাহিত্যের উপাদান অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না।

সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হোলো রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হোলো অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্বদ্বারা নয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কাম প্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জ্জনের দ্বারা নয় যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হোলো বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে একশ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয়

আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে সন্দেশ পচামাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হোতে পারে না। কেননা উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক্, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক আম। যে ভাবে সেটা ভোগ্য সেভাবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্চে ওর প্রাণের লাবণ্য; এই-খানে সন্দেশের চেয়ে তাব শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী,তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পাবে—কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণ পদার্থের বর্ণ উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রস-বিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়-পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়,—আর র‍্যাস্পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতি কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়। পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের অনুকূল কথা হোতে পারে; কিন্তু এই রকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসঙ্গত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়াল এই—সাহিত্যের বিচার হচ্ছে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হোতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার্ন্ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ণ্স্ থেকে তার সুরু। এই ঝোঁকে

এক সঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা ওয়ার্ডস্বার্থ কোলরিজ শেলী কীট্‌স।

সমাজে সর্ব্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই, সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে—রচনায় নিখুঁত রীতির কোঁটা তিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্ণ্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জ্জি এসে উপস্থিত। "কুমুদ-কহ্লার সেবিত সরোবর" হচ্চে সাধু-কারখানায় তৈরী সরকারী ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে বুলি সরিয়ে পূরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে "ধিক্‌"।

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া স্থুরু করলাম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে তর্জ্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। য়াই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্চে ব্যক্তিগত খুসির দৌড়। ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করে-ছিলেন, সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্ম্মগত সকলপ্রকার স্থূল

বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্য্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্য্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম ক'রে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরূপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্প-কলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলা-বিধৌ। যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনা-কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্কে জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিষ ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো

তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা, মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড-স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়, সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান, সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়, সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।

কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রং লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসঙ্কোচে। বলতে চায় মোহ জিনিষটাতে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে, বলছে

মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গীতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি একথা কবুল করতেই হবে। ইসারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয় সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারিনি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙীন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে লেগেছে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সঙ্কোচ লাগে? এই সঙ্কোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই? সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে আচ্ছন্ন করে না তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্য্যকে কি নিঃস্ব হোতে হয় না?

কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিষটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন রয়ে বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাৎ দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারী আদর্শে কাজচালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হোলো কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে! সঙ্গীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়,

আত্মীয় সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা বাস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তাহোলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে? নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয় সম্বন্ধবন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষটা স্বয়ং ঠিক মতো কী সেইটেই বিচার্য্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীতযুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন—I am the greatest laugher of all—বলছেন আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্য্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, এ্যাপলো দেবতার চেয়ে। Than the frog and Apollo এটা হোলো ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হোত সমুদ্র তাহোলে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বলতে

পারত ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হোতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উল্টোছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হোলো ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয় একথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাইনে। এমন কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু অতি বড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে হাসি সূর্য্যের, যে হাসি ওক্ বনস্পতির, যে হাসি এ্যাপলোর, সে হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙীন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে, সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না বস্তু চাই। ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং বল্‌লে প্রায় বারো আনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জ্জমা ক'রে দিই। তর্জ্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে—চেষ্টাও সফল হবে না।

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।

তোমার চোখে আত্মহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো,—
তোমার ঐ মিলেমিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন
ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধূলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেককালের যে মাধুরী, তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্দ্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয়, তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তাহোলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্চে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো। ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটি জুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশকরা কাঁচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটি-জুতোর মালা like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson

reflections against the windows ef cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া, তারা জিজ্ঞাসা করবে, "মানে কি হোলো, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, না হয় হোলোই বা তার রং লাল।" উত্তরে বলতে হয়, "চেয়েই দেখো না" "দেখে লাভ কী ?" তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজরা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে—সে থাকতে পারল না, বলে উঠল, "দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেসচিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, স্থির হয়ে বোস্। তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে

বলে উঠল, "কী সুন্দর।" কবি বলছেন, শুনে I was mildly abashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও, একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্চে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত সুরু ক'রে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বল্‌তে চায় আমি দ্রষ্টব্য। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিসির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্ম্ম-নৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারিনে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর, কেউ কাজের কেউ অকাজের, কিন্তু

সৃষ্টির ক্ষেত্রে, কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহি নেই, যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য তাহোলে সেটা বর্জ্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন,—

এঘরে ওঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা
ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেক্‌ল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুক্‌ছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে:—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,

কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্চে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই :—

His soul stretched tight across the skies
that fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock ;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জ্জনা-ওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল।—বললেন,—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling ;
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিঁকল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্‌মক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে

নির্ব্বিকার নন্। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া —

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্চে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্চে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেককালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙীন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয় কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি নাও ফোটে তাহোলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষায় বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না কিন্তু অধিকাংশ জগৎ সংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোম্যাণ্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে।

তারপরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হোতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে অনাবৃত আকাশে পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্ন রকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে, কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে আকৃতি, তারও অন্তরে কেউবা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে, মনে করে না গূঢ় ব'লে কিছুই নেই, মনে করে না যা প্রতীয়মান তাতেই সব কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত কিছু আদব ও আব্রু, তা সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্ত্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে সকল শোভন রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জান্‌ত তাকে দুর্ব্বল ব'লে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল, বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধ'রে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা।

আমি তা মনে করিনে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বল্‌ব না ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী,তাহোলে আমি বল্‌ব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গত-ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারি। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখ্‌ছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হোলো। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সন্ত-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখ্‌ছেন :—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিইনে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর এক আকাশে আর এক পৃথিবীতে
বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচ গাছে ফুল ধরে
জলের স্রোত বায় বয়ে॥

আর একটা ছবি :—

নীল জল ·· ·· নির্ম্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা :—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে শাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার পরে।

একটি বধূর কথা :—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো তাতে কপাল ঢাক্‌ত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করৃছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হোলো যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হোত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজারবার ডাকলেও মুখ ফেরাতাম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।

আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল,—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙশার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয়নি, তেমনি তারপরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছিনে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। ষ্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে এ'কে ব্যঙ্গ করলে জিনিষটা আধুনিক হোত। কেননা সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুক্‌নো চিংড়ি মাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তরে দেড় লাইন ভরে ফুটকি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী

হোলো?" একেলে কবি উত্তর করত, "এমনতরো হয়েই থাকে।" "অন্যটাও তো হয়।" "হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর সৌখীন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।" সেকেলে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে সেটা পচামাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্চে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধূলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে, বলে আসল জিনিষটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়-গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই :—বুড়ি মারা গেল—সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলি-গুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনর টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তাহোলেই কি যথেষ্ট হোলো? এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন? একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তাহোলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে কিন্তু তার পরেই যদি

বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্‌ট এল, সে তা'র যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে, মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তাহোলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তাহোলে সন্দেহ করব তারো মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখতেন অতি আধুনিকরা বাছাই করেন না সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায় খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাৎ এই যে, এঁরা সর্ব্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার সখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিষ খায়, দূষিত জিনিষ ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিষে তাদের পক্ষপাত, তাতে ফল হয়, অভালো জিনিষেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তাহোলে শুচি জিনিষে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়? কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলি পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না—প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব সাধনা ব'লে বাহাদুরী করতে হবে?

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন:—

রিচার্ড কোডি যখন সহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত,
ছিপ ছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন, গুড্ মর্ণিং, আমাদের নাড়ি উঠত চঞ্চল হয়ে।

চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা কিছু এঁর চোখে পড়ত, মনে হোত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এদিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে,—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।*

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয়, তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নিচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্চে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-

* মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জ্জমা করতে হোলো, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

বসরক্তের কদর্য্য সমাবেশ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতি-শাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্য সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এই রকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া,—এমন কথা সে খুসি হয়ে বলতে সুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা ?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে ওঠা পচা জিনিষের মতো যত কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে, লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলি-রেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এযুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ করো তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।

১৩৩৯

পরিশিষ্ট

পত্রালাপ *

১

লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মতো, অপরিচিত লোক দেখলেই দৌড় দেয়। আবার পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্য শ্রী পাওয়া যায় না।

কাজটা দু'রকমে নিষ্পন্ন হোতে পারে। এক, কোনো একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দু'জনে বাদ প্রতিবাদ করা। কিন্তু তার একটা আশঙ্কা আছে, মীমাংসা হবার পূর্বেই বিষয়টা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। আর এক, কেবল চিঠি লেখা। অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা। কেবল লেখার জন্যেই লেখা। অর্থাৎ ছুটির দিনে দুই বন্ধুতে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, তার পরে যেখানে গিয়ে পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না—এবং পথ হারালেও কোনো মনিবের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নেই।

দস্তুরমতো রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিষের চেয়ে "ফাউ" যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়; অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে

* পরলোকগত লোকেন পালিতকে লিখিত।

ভীষ্ম এবং ভীম, সূর্য্যমুখীর চেয়ে কমলমণি বেশি প্রিয় ব'লে বোধ হয়।

অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয়; কিন্তু তাই ব'লে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্রে ধ'রে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্য্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মতো হয় না। সে রকম আঁটাআঁটির প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজন আছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বত্র তারই বড়ো বাহুল্য দেখা যায়। সেগুলো পড়লে মনে হয় যেন সত্য তার সমস্ত সুসংলগ্ন যুক্তিপরম্পরা নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোথা থেকে আবির্ভূত হোলো! মানুষের মনের মধ্যে সে যে মানুষ হয়েছে, সেখানে তার যে আরো অনেকগুলি সমবয়সী সহোদর ছিল, একটি বৃহৎ বিস্তৃত মানসপুরে যে তার একটি বিচিত্র বিহারভূমি ছিল, লেখকের প্রাণের মধ্যে থেকেই সে যে প্রাণ লাভ করেছে, তা তাকে দেখে মনে হয় না। মনে হয় যেন কোনো ইচ্ছাময় দেবতা যেমন বললেন "অমুক প্রবন্ধ হোক" অমনি অমুক প্রবন্ধ হোলো—"লেট দেয়ার্ বি লাইট এণ্ড দেয়ার ওয়াজ্ লাইট্।" এই জন্য তাকে দিয়ে কেবল আমাদের মাথার খাটুনি হয়, কেবলমাত্র মগজ নিয়ে সেটাকে হজম করবার চেষ্টা করা হয়; আমাদের মানসপুরে যেখানে আমাদের নানাবিধ প্রাণবান পদার্থ জন্মাচ্চে খেলছে এবং বাড়ছে সেখানে তার স্বর পরিচিতভাবে প্রবেশ করতে পারে না; প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়, সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হয়; তার সঙ্গে কেবল আমাদের একাংশের পরিচয় হয় মাত্র, ঘরের লোকের মতো সর্ব্বাংশের পরিচয় না।

ম্যাপে এবং ছবিতে অনেক তফাৎ। ম্যাপে "পর্স্পেক্টিভ"

থাকতে পারে না; দূর নিকটের সমান ওজন, সর্ব্বত্রই অপক্ষপাত; প্রত্যেক অংশকেই সূক্ষ্মবিচার মতো তার যথাপরিমাণ স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিতে হয়; কিন্তু ছবিতে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে; অনেক বড়ো ছোটো হয়ে যায়; অনেক ছোটো বড়ো হয়ে ওঠে; কিন্তু তবু ম্যাপের চেয়ে তাকে সত্য মনে হয়, তাকে দেখবামাত্রই এক মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত চিত্ত তাকে চিনতে পারে। আমরা চোখে যে ভুল দেখি তাকে সংশোধন করতে গেলে ছবি হয় না, ম্যাপ হয়। তাকে মাথা খাটিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। যে কারণে খনিজ পদার্থের চেয়ে প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পারি, সেই কারণে আমাদের একেবারে অমিশ্র খাঁটি সত্য কঠিন যুক্তি আকারে আমাদের অধিকাংশ পাকযন্ত্রের পক্ষেই গুরুপাক। এই জন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে দিলে সেটা লাগে ভালো।

সেই কাজ করতে গেলেই প্রথমতঃ একটা সত্যকে এক দমে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেখা যায় না। কারণ, অধিকাংশ সত্যই আমরা মনের মধ্যে আভাসরূপে পাই, এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ করে গড়ে পিটে তার একটা আগাগোড়া খাড়া ক'রে তুলতে চেষ্টা করি। সেটাকে বেশ একটা সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ আকার না দিলে একটা চলনসই প্রবন্ধ হোলো না মনে করি। এইজন্যে নানা-বিধ কৃত্রিম কাঠ খড় দিয়ে তাকে নিয়ে একটা বড়ো গোছের তাল পাকিয়ে তুলতে হয়।

আমি ইংরেজি কাগজ এবং বইগুলো যখন পড়ি তখন অধিকাংশ সময়েই আমার মনে হয়, যে, একটা কথাকে একটা প্রবন্ধ কিম্বা একটা গ্রন্থে পরিণত করতেই হবে এই চেষ্টা থাকাতে প্রতি-দিনকার ইংরেজি সাহিত্যে যে কত বাজে বকুনির প্রাদুর্ভাব হয়েছে

তার আর সংখ্যা নেই—এবং সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা কত দুঃসাধ্য হয়েছে। যে কথাটা বলা হচ্চে সেটা আসলে কত সহজ, এবং সংক্ষিপ্ত, সেটাকে না-হক কত দুরূহ এবং বৃহৎ ক'রে তোলা হয়! আমার বোধ হয় ইংরেজি সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে;—তিন ভল্যুম না হোলে নভেল হয় না এবং মাসিক পত্রের এক একটা প্রবন্ধ দেখলে ভয় লাগে। আমার বোধ হয় নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি যদি অত বড়ো আয়তনের কাগজ না হোত তাহোলে ওর লেখাগুলো ঢের বেশি পাঠ্য এবং খাঁটি হোত।

আমার তো মনে হয় বঙ্কিম বাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যতবড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিষ্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তাহোলে বড়ো অসহ্য হয়ে উঠত—বিশেষতঃ সমালোচকের পক্ষে। এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক, যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্ব্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রা গান করার মতো। প্রাচীন কালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশক সম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাওর কাটবার সময় ছিল।—এমন কি, জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিষগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হোত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়, প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি ক'রে বিস্তর সারবান কোষ পূরতে চেষ্টা ক'রে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারি করেছেন বটে এবং একজন লোকের সঙ্কীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেন নি কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরি একটাকে ভেঙে

ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হোত। জর্জ এলিয়টের এক একটি নভেল এক একটি সাহিত্য কাঁঠাল বিশেষ।

সত্যকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলে তাকে একটা প্রচলিত দস্তরমতো আকার দিয়ে সত্যের খর্ব্বতা করা হয়, অতএব তাতে কাজ নেই। তা ছাড়া সত্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করা যাক যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্চে। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্ত্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক, তাহোলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না।

আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোনো একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে ক'রে তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য ব'লে মনে হয় তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপন জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপন মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে তখনি সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়। এই জন্যে বিজ্ঞান দর্শন সবই সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে থাকতে পারে এবং ক্রমেই মিশিয়ে যায়। প্রথম গজিয়ে তারা দিনকতক অত্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে, তার পরে মানবজীবনের সঙ্গে তা'রা যতই মিলে যায় ততই সাহিত্যের অন্তর্ভূত হোতে থাকে, ততই তার উপর সহস্র মনের সহস্র ছাপ পড়ে এবং আমাদের মনোরাজ্যে তাদের আর প্রবাসীভাবে থাকতে হয় না।

এই রকম সাহিত্য আকারে যখন সত্য পাই, তখন সে সর্ব্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।

কিন্তু সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী হয় ব'লেই সাধারণের কাছে অনেক সময় তার বিশেষ গৌরব চলে যায়। যেন সেটাকে সহজে গ্রহণ করা যায় ব'লে সেটাকে সৃজন করাও সহজ! তাই আমাদের সারবান সমালোচকেরা প্রায়ই আক্ষেপ ক'রে থাকেন, বাংলায় রাশি রাশি নাটক নভেল কাব্যের আমদানি হচ্চে। কই হচ্চে! যদি হোত, তাহোলে আমাদের ভাবনা কী ছিল!

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানত কিম্বা অজ্ঞানত মানুষকেই সব চেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী ক'রে রেখে দিইনে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয় কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্চে এবং আসছে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে ধরে রাখে; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ ক'রে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে গঠিত হয়—আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালোবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষ-গোচর নয় ব'লে অনেকে এ'কে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখলে বিজ্ঞান দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হোতে পারে কিন্তু সাহিত্য ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান দর্শনে মানুষ গঠিত হোতে পারে না।

কিন্তু আমি তোমাকে কী বলছিলুম, সে কোথায় গেল! আমি

বলছিলুম, কোনো একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হোলো। তার মীমাংসাই বা নাই হোলো। কেবল দুজনের মনের আঘাত প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—যাতে ক'রে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেলতে পারে—এই হোলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এ রকম সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না—সকলেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত এই জন্যে অধিকাংশ মাসিক পত্র মৃত মতের মিউজিয়ম বললেই হয়। মতসকল জীবিত অবস্থায় যেখানে নানা ভঙ্গীতে সঞ্চরণ করে সেখানে পাঠকদের প্রবেশ লাভ দুর্লভ। অবশ্য, সেখানে কেবল গতি, নৃত্য এবং আভাস দেখা যায় মাত্র, জিনিষটাকে সম্পূর্ণ হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না, কিন্তু তাতে যে এক রকমের জ্ঞান এবং সুখ পাওয়া যায় এমন অন্য কিছুতে পাবার সুবিধে নেই।

১২৯৮

২

তুমি আমাকে খানিকটা ভুল বুঝেছ সন্দেহ নেই। আমিও বোধ করি কিঞ্চিৎ ঢিলে রকমে ভাব প্রকাশ করেছি—কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ ভুল না বুঝলে অনেক সময় এক কথায় সমস্ত শেষ হয়ে যায়, অনেক কথা বলবার অবসর পাওয়া যায় না। খাবার জিনিষ মুখে দেবামাত্র মিলিয়ে গেলে যেমন তা'র সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা যায় না তেমনি ভুল না বুঝলে, শোনবামাত্র অবাধে মতের

ঐক্য হোলে, কথাটা একদমে উদরস্থ হয়ে যায়—রয়ে ব'সে তার সমস্তটার পূরো আস্বাদ পাওয়া যায় না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ সে যে তোমার দোষ তা আমি বলতে চাইনে। আপনার ঠিক মতটি নির্ভুল ক'রে ব্যক্ত করা শক্ত। এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে, সেই লোকটাই যে সব সময় লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটি ভাবুক-মনুষ্যের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। তিনি অনেক সময়ে অনবধানতা কিম্বা অক্ষমতা বশতঃ ভাবুকের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেন না। আমি মনে করছি, আমার যেটি বক্তব্য অমি সেটি ঠিক লিখে যাচ্চি, এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠছে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন পাশের রাস্তায় চলে গেছেন আমি হয়তো তা জানতেও পারিনে।

সাহিত্য যে কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ, আমার চিঠিতে যদি এই কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহোলে অগত্যা যতক্ষণ পারা যায় তার হয়ে লড়তে হবে, এবং সে কথাটার মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা সমস্তটা আদায় ক'রে নিয়ে তার পরে তাকে ইক্ষুর চর্ব্বিত অংশের মতো ফেলে দিলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা যে ভাবে চলেছি তাতে তাড়াতাড়ি একটা কথা সংশোধন করবার কোনো দরকার দেখিনে।

তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে তবে শেক্সপিয়রের নাটককে কী বল্বে। সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব অতএব একটু খোলসা ক'রে বলি।

কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত শকুন্তলা এক নয়,—তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তর প্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেই জন্য তাঁরা

আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকার প্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই ব'লে বলা যায় না যে কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি— কিন্তু তবু একথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে নইলে সে অন্যরূপ হোত। তেমনি শেক্সপিয়রের অনেকগুলি সাহিত্য-সন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে ব'লে যে তাদের মধ্যে শেক্সপিয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে। সে রকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃঅংশ হতে বিচ্যুত হোতে হয়। ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরেব মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা ক'রে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য। অন্তরে বাহিরে এই রকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তিবলে রস্‌ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পাবা যায় কিন্তু শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল, নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হোত। অতএব এক হিসাবে শেক্সপিয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত, বৃহৎ এবং বিচিত্র।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্চে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোনখানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গ'লে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত-ভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেই-

খানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি রচনা করে। পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

গেটে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদরহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায়নি, অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিতভাবে তার মধ্যে আছে। যিনি যাই বলুন শেক্সপিয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত্ত ভাবশরীরী শেক্সপিয়রকে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে।

সাহিত্যের সত্য কা'কে বলা যেতে পারে এইবার সেটা বলবার অবসর হয়েছে।

লেখাপড়া, দেখাশোনা, কথাবার্ত্তা, ভাবাচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি আপন মূল প্রকৃতি আছে। সেই মূল প্রকৃতি অনুসারে, আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্ব্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্ম্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার সেই বিশেষ প্রকৃতি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে বিরাজ করবেই। আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্ম্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূল সত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে

এই জন্যে এ'কেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হোতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হোলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয় এই সত্যটি সঙ্কীর্ণ হোলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি, ফরাসী কবি গোটিয়ে রচিত "ম্যাড্‌মোয়াজেল্ ডে মোপ্যাঁ" প'ড়ে (বলা উচিত, আমি ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল—গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূল প্রকৃতি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেইটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারিনে। গ্রন্থের মূল ভাবটা হচ্চে একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্য্যের সন্ধান ক'রে ফিরচে। সৌন্দর্য্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ শতদলের উপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনি-গহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন, যেন তা গোপনে আহরণ ক'রে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মতো কৃপণের সঙ্কীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিষ। এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না; রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্য্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনি বুঝতে পারি সৌন্দর্য্য এই তো আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনাতে পূর্ব্বোক্ত ফরাসী গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে। ম্যাডমোয়াজেল্ ডে মোপ্যাঁ এবং গোটিয়ে সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ভ্রমাত্মক হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে—কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার কথাটা কতকটা পরিষ্কার করা

গেল। শেলি বলো, কীট্‌স্‌ বলো, টেনিসন্‌ বলো সকলের লেখাতেই রচনার ভালোমন্দর মধ্যেও একটা মর্ম্মগত লেখক-প্রকৃতি আছে, তারি উপর ঐ সকল কবিতার ধ্রুবত্ব ও মহত্ত্ব নির্ভর করে। সেই জিনিষটাই ঐ সকল কবিতার সত্য। সেটাকে যে আমরা সকল সময়ে কবিতা বিশ্লেষণ ক'রে সমগ্র বের করতে পারি তা নয়, কিন্তু তার শাসন আমরা বেশ অনুভব করতে পারি।

গোটিয়ের সহিত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্ব্বোক্ত ফরাসী সৌন্দর্য্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্প পল্লব নদী নির্ঝর পর্ব্বত প্রান্তর সর্ব্বত্রই নব নব সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্চেন—তাতে ক'রে সৌন্দর্য্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই ;—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।

আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাকে ততই উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ব'লে সম্মান করি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ যদি সমস্ত জগৎকে অন্ধ যন্ত্রের ভাবে মনে ক'রে কাব্য লিখতেন, তা-হোলে তিনি যেমনই ভালো ভাষায় লিখুক না কেন সাধারণ মানব-হৃদয়কে বহুকালের জন্যে আকর্ষণ ক'রে রেখে দিতে পারতেন না। জগৎ জড় যন্ত্র কিম্বা আধ্যাত্মিক বিকাশ এ দুটো মতের মধ্যে কোনটা সত্য সাহিত্য তা নিয়ে তর্ক করে না—কিন্তু এই দুটো ভাবের মধ্যে কোন ভাবে মানুষের স্থায়ী এবং গভীর আনন্দ সেই সত্যটুকুই কবির সত্য, কাব্যের সত্য।

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন ক'রে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ ক'রে তোলা—সাহিত্য এমনি ক'রে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার ব'লে অনুভব করছি।

১২৯৯

৩

আমার প্রধান কথাটা এই—সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্চে মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত জগৎ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব প'ড়ে একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জ্বল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; তেমনি বিশ্বের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা বিরাট প্রকৃতিতে আমাদের নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে তাকে মানবীয় ক'রে তুলি; তখনি সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্যোদয় সূর্য্যাস্ত সর্ব্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকল প্রকার আলোকে প্রধানত নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কাররূপে নয়, নিতান্ত বাধাগ্রস্ত আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্ম্মল ক'রে দেখাতে পারে। সুইজর্‌ল্যাণ্ডের শৈল-সরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বলতে পারো সেখানকার উদয়াস্ত কী রকম অনির্ব্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেই রকম। বড়ো বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিষকে এমন ক'রে প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দ্দিষ্ট-রূপে প্রভেদ ক'রে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কুণো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতি-টাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব, লেখকের মূলপ্রকৃতি যতই ব্যাপক হবে, মানব- সমাজ এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে না ভেঙে ফেলবে, আপনার জীবনের দশদিক উন্মুক্ত ক'রে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বার করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘরগড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তাহোলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতো-বিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা

বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করচে সেটি হচ্চে লেখকের মর্ম্মস্থান—অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্সপিয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এই জন্যে, যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূল-তত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন ক'রে তুলেছেন তাকে দুই চারটি সুসংলগ্ন মত-পাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এই জন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন রচয়িতার স্বভাবগত ঐক্য নেই।

সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলিনে—কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মতো অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই; সাক্ষাৎভাবে, বা পরোক্ষ ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষ-টিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মতো।

কিন্তু, এই হাসি কান্না অনুরাগ বিরাগ কোথা থেকে উঠচে? ফল্‌ষ্টাফ্ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ ক'রে লিয়র্ ও হ্যামলেট পর্য্যন্ত শেক্সপিয়র যে মানবলোক সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসিঅশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারো অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপিয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে শেক্সপিয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি

নভেল যতই চিত্রবিচিত্র ক'রে রচিত হোক, তার ভাষা এবং রচনা-কৌশল যতই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক, শেক্সপিয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেক্সপিয়রে বর্ণিত প্রতিদিন দুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হোলে সাহিত্যের সত্য কা'কে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্সপিয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্য্যন্ত আলোড়িত ক'রে শেক্সপিয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত ক'রে দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখানে থেকে মানব প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গোটিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্চে ঠিক এর বিপরীত। গোটিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেছেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখতে পাইনে। যে সৌন্দর্য্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য্য ভালোবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্য্যকে অবারিত ক'রে দেয়—মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্য্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না ক'রে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এই জন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ সেটা এক-রকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই, অতএব মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে, সাহিত্যের সত্য কথাটা ততই বেশি বেড়ে যাবে।

কিন্তু অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে সেটা হচ্চে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ কববার উপায়গুলি অযথা হোলেই সেটা মিথ্যা হোলো, এবং যথাযথ হোলেই সত্য হোলো।

এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্চে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কী শেষ সত্য?

জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্চে প্রটোপ্লাজম, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্লাজম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্লাজমের মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্লাজমকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্চে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্চে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং হৃদয়েব তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য্য, যে, প্রকাশ হওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয় কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ কিন্তু বীজকে গাছ বলা যায় না।

সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা ক'রে দেখো, তাহোলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু ক'রে চলে যাচ্চে; তার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি সাহিত্যে থাকছে। এই

জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্ব্বের সহিত রক্ষা করে।

১২৯৯

৪

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না—সমস্তটার একটা প্রতিভূ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিভূ কা'কে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ ব'লে মানতে আমাদের আপত্তি নেই। ভালোবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি; এরা যদি অবস্থানুসারে মানব-প্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে, তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেন না এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে;—এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভালো এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা ক'রে সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মানবে? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য? সেটা কি আমাদের অনেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণ-ব্যাপী নয়? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি—এই জন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু

কোনো বাস্তবানুরাগী যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ৎ দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেমনি ; তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস ; তারা দুর্ব্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ ক'রে নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখনো কোথাও কোনো স্থায়ী গৌরব লাভ করেনি।

নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ্য।

প্রকৃতি বর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কী তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথাই নেই—কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কী রকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন কি, ভাষা তা ছাড়া আর কিছু পারে না। চিত্রকর যে রং দিয়ে আঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয়নি—কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের হৃদয়ের দোলায় লালিত-পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত ক'রে নিছক বর্ণনাটুকু ক'রে গেলে যে কাব্য হয় একথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্য্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্য্যের ছবি নয়, মানবের ছবি—ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কী গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিষ যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে যতই সচেতন হব, প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই তো কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সে তো বর্ণনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিষ, প্রকৃতির জিনিষ নয়। অতএব, এমন কোনো বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম্ম নেই কিম্বা যা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে বদ্ধ নয়।

১২৯৯